MA-09-BENG-1.3

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম (০৯)
M. A. in Bengali (09)

প্রথম ষাণ্মাসিক

তৃতীয় পত্র (Paper : 3)
আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকের ইতিহাস

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

প্রথম বিভাগ ঃ বাংলা কবিতার ইতিহাস— উনিশ শতক
দ্বিতীয় বিভাগ ঃ বাংলা কবিতার ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত
তৃতীয় বিভাগ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস— উনিশ শতক
চতুর্থ বিভাগ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

Contributor :

Sri Ratnadip Purkayastha — Department of Bengali, Digboi Mahila Mahavidyalaya

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty — HOD, Dept. of Bengali, Gauhati University

Proof Reading & Language Editing :

Sanjay Chandra Das — Research Scholar, Dept. of Bengali, Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia — Editor, Study Material, GUIDOL

Cover Page Design :

Bhaskar Jyoti Goswami — GUIDOL

ISBN No : 978-81-928318-2-4

Reprint : September, 2018

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work be reproduced in any form, by mimeography or any other means, without permission in writing from the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning. Further information about the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning courses may be obtained from the University's office at Idol Building, Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning by Prof. Amit Choudhury, Director and printed under the aegis of GU Press as per procedure laid down for the purpose. Copies printed 500.

পত্র পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকের ইতিহাস শীর্ষক পাঠক্রমে অর্থাৎ তৃতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই।

এই তৃতীয় পত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকের ইতিহাস। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথাগত আলোচনা শুরু করার আগে পাঠক্রমের তাৎপর্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আসুন আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি ভূমিষ্ঠ হল। বাংলা ভাষা এই নতুন সৃষ্ট ভাষাগুলির অন্যতম। চর্যাগানগুলির মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাভাষার পদচারণার প্রথম সূত্রপাত। হাজার বছর আগে এক বিশিষ্ট ধর্মসাধনার ইঙ্গিত-প্রকরণ ও সাধনা পদ্ধতি ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে তা সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্র ফসল ফলিয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম ভাবনাশ্রিত জীবনবৃত্তকে ত্যাগ করার ফলে আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য বিষয়গৌরবে ধনী হয়ে উঠল। শুধু বিষয়বস্তু নয়, পরিবর্তন সাধিত হল আঙ্গিক এবং রূপ-রীতিতেও; ছন্দ নির্ভরতার পরিবর্তে বাংলা সাহিত্য আশ্রয় গ্রহণ করল গদ্যের সাবলীলতায়। নব নব ভাব-কল্পনার প্রকাশে, নতুন নতুন প্রতিভার স্পর্শে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের শিরোপা অর্জন করল। কিন্তু সাহিত্য সময় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একক বা স্বয়ম্ভু কিছু নয়। তাই বাংলা সাহিত্যের এই বিশ্ববীক্ষা ও হাজার বছরের এই পরিক্রমায় হাজার বছরের বাঙালি জীবন ছায়াপাত করেছে, বাঙালির দেশ-কাল, সময়-সমাজ, প্রতিবেশ-পরিসর, সংঘাত-সংশ্লেষের ছাপটি মুদ্রিত হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কালপর্বের বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতিগুলির অন্তরঙ্গে ধরা পড়েছে বৃহত্তর বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, তার পালাবদলের ইতিহাস।

বস্তুত আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যের যে প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধি তার উৎসটি নিহিত রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন চর্যাপদের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চর্যাপদের যুগ থেকেই ধর্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল মূলত একই ধরনের। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অবস্থা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হলেও বাঙালির জীবনযাত্রা-প্রণালিতে কোনো বৃহত্তর পরিবর্তন আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। যে যুগে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। খণ্ডিত জীবনবোধ, সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামক্ষত মানুষের উচ্চকণ্ঠ বেদনা তৎকালীন সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

তবু, ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের দিনগুলিতেও তৎকালীন সাহিত্যে মানবতা ও জীবনমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং রোসাঙ রাজদরবার কেন্দ্রিক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া অব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে

বাংলা সাহিত্যে নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন মানবতারই নবায়ন ঘটেছিল। বস্তুত আদি যুগ-মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সাহিত্য একই মৃত্তিকাসম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে বাঙালির ধ্যান ও সাধনা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির সমগ্র চেতনা-প্রবাহ ধরা পড়েছে। বাঙালি জাতি বা বাংলাসাহিত্য নিরালম্ব বা স্বয়ম্ভু নয়। আধুনিক বাঙালি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার হাজার বছরের উত্তরাধিকার প্রবহমান। অতএব, আমাদের আত্মপরিচয় উদঘাটনের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন। আর এই আত্মানুসন্ধানের মানদণ্ডেই আমাদের আলোচ্য পাঠক্রমের উপযোগিতা।

উনিশ শতক এবং তৎপরবর্তীকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত। উনিশ শতক থেকেই আধুনিক যুগের আরম্ভ। মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনাশ্রিত ছন্দনির্ভর বাংলা সাহিত্যধারায় এই শতকেই অযুত সম্ভাবনা রূপলাভ করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নবজাগ্রত বাঙালি-মানস তার আত্মপ্রকাশের জন্য বিবিধ নতুন নতুন পথের অনুসন্ধান করেছিল। এই বিভাগের লক্ষ্য হল উনিশ শতকের নবজাগরণ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যে বহু-বিচিত্র উৎসার, বিকাশ ও পরিণতি— সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করা। এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারাটিকে অনুসরণ করব। আধুনিক বাংলা কাব্য ও নাটকের রূপরেখা কেন্দ্রিক সামগ্রিকতার ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালক্রমকে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। আসুন, আমাদের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক—

অধ্যায়-১ ঃ বাংলা কবিতার ইতিহাস— উনিশ শতক
অধ্যায়-২ ঃ বাংলা কবিতার ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত
অধ্যায়-৩ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস— উনিশ শতক
অধ্যায়-৪ ঃ বংলা নাটকের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত সমালোচক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার শেষে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির তালিকা সংযোজিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থ আমরা সরবরাহ করতে পারছিনা, তাই আশা করব এগুলি আপনারা নিজে সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। বক্ষ্যমাণ পত্রে আলোচনা সংক্ষিপ্তির অনুরোধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা বা বিষয়ের উল্লেখযোগ্য রচনাকার এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতিই শুধু আলোচিত হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পঠন বিভাগের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর (Home Assignment) বাড়ি থেকে তৈরি করে পাঠাতে হবে। আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেক উপবিভাগেই প্রশ্নের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে তবু এই উপকরণের অতিরিক্ত পাঠ, আপনাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রথম বিভাগ
বাংলা কবিতার ইতিহাস— উনিশ শতক

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত
১.৩ খণ্ডকাব্য—মহাকাব্য
১.৪ গীতিকবিতার ধারা
  ১.৪.১ রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিসমাজ
  ১.৪.২ রবীন্দ্র-কাব্য
  ১.৪.২ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ
১.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা
১.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Question)
১.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

উনিশ শতকে ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সান্নিধ্য-প্রেরণায় বাঙালি মনন ও বাংলা সাহিত্যে যে পালাবদলের ঘণ্টা বেজেছিল, তারই ফলে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা, মহাকাব্য ইত্যাদির উদ্ভব। রঙ্গলাল-মধুসূদন-বিহারীলাল— সকলেই সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন পশ্চিমের দান, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মূল্যমানে। অবশ্য এই শতকের প্রথমার্ধে কাব্য ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্র্য ধরা পড়েনি, বরং পুরাতন ধারার অনুবর্তন চলেছে আংশিকভাবে। তবে নতুনের জন্ম-সম্ভাবনা তখন আর দুর্লক্ষ নয়। বাংলা কাব্যজগতে যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত মধুসূদনের আগমনের মাধ্যমে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ-কবিতায় বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাই রূপলাভ করেছিল, আর মধুসূদনের কবিতায় ব্যক্তি-চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ। গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মকেন্দ্রিকতা, যা কিনা ধরা পড়েছিল বিহারীলালের কবিতায়— তা রবীন্দ্রনাথে এসে লাভ করল আত্মপ্রসারের ব্যঞ্জনা। এ সমস্তই আধুনিকতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। আসুন, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান প্রধান ধারা এবং উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

১.১ উদ্দেশ্য (Summing Up)

ইংরেজি সভ্যতার স্পর্শ-সান্নিধ্যে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হল, বাংলা সাহিত্য নানা ধারায় প্রবাহিত হল, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও

নতুনত্ব দেখা দিল। পুরাতন একঘেয়েমির স্থানে অজস্র বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বের সূত্রপাত হল কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে। মহাকাব্য, নতুন ধরনের আখ্যায়িকা কাব্য, গীতিকবিতা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটল। অবশ্য যুগসন্ধিকালের কবিতায় পুরাতনের অনুবর্তনও চলছিল আংশিকভাবে— ভাবে, ভাষায়, রীতিতে। এই বিভাগের লক্ষ্য হল খণ্ডকাব্য— মহাকাব্য—গীতিকবিতা—অর্থাৎ আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। নবীন কাব্যসাহিত্যের বিভিন্ন রূপ-রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হব এই অধ্যায়ে, অনুসরণ করব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যসাহিত্যের বিবর্তনের রূপরেখাটিকে, চিহ্নিত করব প্রধান প্রধান কবিদের বিশিষ্ট প্রবণতা সমূহ।

১.২ যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ সফল কবি ভারতচন্দ্রের পর এই শতকের প্রথম সার্থক কবি হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্রে এক যুগের তাৎপর্যপূর্ণ অবশেষ, আর রঙ্গলালে নতুন সম্ভাবনার যাত্রারম্ভ। এই দুই কবির মধ্যে, সন্ধিক্ষণে, বাংলা কাব্যে যাঁর অবস্থান, তিনি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। তিনি যুগোত্তীর্ণ কবি কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, তিনি যে যুগন্ধর কবি এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। কলকাতায় এসে ইংরেজি শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজের রুচিবিকৃতি নয়। ইংরেজি শিক্ষা তাঁর মনোভূমিতে যুক্তিকর্ষণার সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বভাব-গবেষকের অনুসন্ধিৎসা, তাইতো, ঈশ্বর গুপ্ত ১৯ বছর বয়সেই বাংলাদেশে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে দৈনিকে পরিণত হওয়া জনপ্রিয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটির জন্যই তিনি বাঙালি বার্তাজীবীদের আদিপুরুষের মর্যাদা লাভ করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও আরো দুখানি স্বপ্নায়ু পত্রিকার প্রচলন করেছিলেন তিনি। অবশ্য 'সাধুরঞ্জন' অথবা 'পাষণ্ডপীড়ন' পত্রিকা দুটি বেশিদিন টিকে থাকেনি।

প্রখর স্মৃতিধর ঈশ্বর গুপ্ত অনেক কবিতা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির একটা তালিকা করা যাক—

(১) কালীকীর্তন (১৮৩৩)
(২) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত (১৮৫৫)
(৩) প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৮)
(৪) হিতপ্রভাকর (১৮৬১)
(৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (১৮৬২)
(৬) বোধেন্দু বিকাশ নাটক (১৮৬৩)

এছাড়াও তাঁর নামে একটি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম ব্যক্তি যিনি জীবনচরিত রচনার শ্রম স্বীকার করেছেন। অশেষ পরিশ্রম করে তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই দাস প্রভৃতি কবির জীবনচরিত সংগ্রহ করেন। 'প্রভাকরে' এগুলি প্রকাশিত হয়। মহামতি বেথুন সাহেবের অনুরোধে গুপ্তকবি কয়েকটি শিশুপাঠ্য লিখেন। 'হিতপ্রভাকর' গ্রন্থটি তারই সংকলন। ঈশ্বর গুপ্তের একটি মহৎ কীর্তি তিনি

বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন দিকপাল প্রতিভার সৃষ্টি বা বিকাশে সাহায্য করেছেন। দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র-রঙ্গলাল এঁরা আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন গুপ্তকবির সাকরেদ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঈশ্বর গুপ্তই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য কবিতার সংখ্যা অপ্রতুল নয়। তাঁর কবিতার ভুবন জুড়ে রয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের নানা খণ্ডচিত্র। শুধু চিত্র নয় গুপ্ত কবির লেখা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা যুগসংকট, একটা ক্রান্তিলগ্ন। 'কালীকীর্তন' আসলে রামপ্রসাদী ধারারই একটা অনুবর্তন। এই রচনা বাদ দিলে ঈশ্বর গুপ্তের যে সব কবিতা আমরা পড়ি, তাতে একজন পরিহাস-রসিক অথচ সমাজবেত্তা চিন্তাবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কবিত্ব' জিনিসটা ছিল তাঁর স্বভাবের সামগ্রী, এজন্যে কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করতে হয়নি তাঁর। মশা-মাছি-পাঁঠা-মাছ সবই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধির কবি। প্রাচীন যুগের শেষ অনুবর্তন তাঁর মধ্যে— ভাষায়, diction-এ, ভাবেও ক্বচিৎ। আবার তিনিই আধুনিক যুগের প্রথম কবি। উনিশ শতকের কলোনির বুদ্ধিজীবীরা আধুনিকতার দিকে পা বাড়িয়েছেন ধর্ম ও ভক্তিসর্বস্বতার গণ্ডি থেকে সাহিত্যকে মুক্তি দিয়ে, কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগানুভব জীবন সমালোচনা ও নবোত্থিত জাতীয়তার বাণী প্রচার ও দেশানুগত্য প্রকাশ করে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলিও সাধারণভাবে ভক্তিগীতি নয় বরং সুতীব্র জীবনসমালোচনার অম্লকষায় রসে নতুন স্বাদের সৃষ্টি। জাতীয়তার বাণীও তিনি প্রচার করেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব কায়দায়—

"কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

গুপ্তকবি প্রতিকূল সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন— 'মাতৃসম মাতৃভাষা'— বলাবাহুল্য, তখন সংস্কৃতপন্থীরা যেমন বাংলাকে কোনো বিশুদ্ধ ভাষাই মনে করতেন না, তেমনি ইংরেজি নবিশদের কাছে এ ভাষা ছিল অনুর্বর, সম্ভাবনাহীন। বঙ্কিম রঙ্গলালের মতোই সুমহৎ কল্পনার সম্পদ হয়তো ছিল না তাঁর, কিন্তু যা ছিল তা হল রাখঢাক না করা স্পষ্টতা। ঈশ্বর গুপ্তে যে কথা ঋজু, অনাবৃত, তারই অলঙ্কৃত প্রকাশ রঙ্গলাল-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্রে। হৃদয়ভাবের এই অনাবৃত অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গিমার প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন আধুনিক দিনের বাংলা সাহিত্য প্রতিভাস্পর্শে অলঙ্কৃত ও সুন্দর, "কিন্তু এ বুঝি পরের— আমাদের নহে। খাঁটি বাঙালী কথায়, খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই .... মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালার কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি।" এই খাঁটি বাঙালিয়ানাই ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় স্বাদুতা নিয়ে এসেছে। ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধির কবি। যুগসন্ধির অনিবার্য স্ববিরোধ তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। বিধবা বিবাহ আন্দোলন কিম্বা স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নে প্রভাকরের নিবন্ধে-সম্পাদকীয়ে প্রচ্ছন্ন সমর্থনই রয়েছে তাঁর। এছাড়াও আমরা দেখেছি, প্রথম লেখা বাদ দিলে ভক্তিনির্ভর রচনা তিনি বাদ দিয়েছেন, আধুনিক যুগের শিল্প-সাহিত্য-ভাবনারই অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন তিনি কবিতার কনটেন্টে, হয়তো বা ফর্মেও কিছুটা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের

ভক্তিহীন কবিতা, ব্যক্তি মনের মাধুরী/অম্লতা মেশানো কবিতাতো এর আগে লেখা হয়নি। অথচ স্ত্রী শিক্ষার ফলশ্রুতি কী হতে পারে— তার ব্যাখ্যা দেন একেবারে প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো—

"এ. বি পড়ে বিবি সেজে
....বিলিতি বোল কবেই কবে,
'ড্যাম হিন্দুয়ানী' বলে
বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে...."

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রতিকূল ছিলেন না ঈশ্বর গুপ্ত, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার নাম করে সেখানে উৎকট সাহেবপ্রীতি, সেখানেই বোধ করি গুপ্ত কবির বিদ্রূপ—

"তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোটে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে।।"

মনে হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে যেখানে নিজস্বতা বিসর্জন, যেখানে সামাজিক অনাচার, ব্যভিচার, চারিত্র্যদৈন্য ও আদর্শহীনতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই কবিতার কশাঘাতে উন্মত্ত সমাজকে প্রকৃতিস্থ করতে চেয়েছেন তিনি। আর এজন্যই সমাজ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে তার সংরক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় ধরা পড়ে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবকে প্রভাকরের গদ্য নিবন্ধে সমর্থন জানিয়েও তিনি লেখেন— 'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে/সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে?' —তখন কবির মনে প্রোথিত সতীত্বের মানদণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। নবীনকে বরণ করতে গিয়ে নিজেই স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হয়েছেন কবি বারবার। হয়তো কবির রঙ্গপ্রিয় মনের স্বভাবদোষই এর জন্যে দায়ি। স্যাটায়ার মিশ্রিত কৌতুকরস সৃজনের স্বার্থে কখনও ঈশ্বর গুপ্ত আঘাত করেন বিদ্যাসাগরকেই—

"কানে কানে এ কথাটি বলিবেন তারে। (বিদ্যাসাগরকে)
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে।" (বিধবা বিবাহ)

কাব্যে কখনও জাতীয়তার বাণী প্রচার করেও দিল্লির যুদ্ধে জয়ী ইংরেজদের জয়গান করতে দেশবাসীকে আহ্বান করেন ঈশ্বর গুপ্ত। রাজশক্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন না তিনি, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার অন্তরালে ধর্মান্তরণের চেষ্টাকে মেনে নিতে পারেননি।

লক্ষ করার মতো যে নীতিগত প্রশ্নে ঈশ্বরগুপ্ত রক্ষণশীল না হলেও নতুন সামাজিক পরিবর্তনগুলি মানতেও পারেননি। সংস্কারে বেঁধেছে কোথাও। এই স্ববিরোধ বোধ করি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দিনগুলিতে অনিবার্য ছিল। আবার এও বলা চলে, সমসাময়িক নকশাকারের মতো বাঙালির হুজুগপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে ভালোমন্দে ভেদ করতে পারেননি কবি। খাদ্যবস্তুকে নিয়ে একের পর এক কবিতা লিখেছেন, সমাজ-রাষ্ট্র-পরিবেশ— নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সবই তার বিষয় হয়ে এসেছে। ব্যঙ্গ করেছেন নিজেকেও। মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ও লেখা কবিতায় রানিকে কল্পতরু এবং নিজেদের 'পোষা গরু' বলে চিহ্নিত করার মধ্যে যে কটু রস আছে, তার মূলে এক সচেতন বার্তাজীবীর অসহায়ত্বই বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত ও কবি ঈশ্বর গুপ্তর মধ্যে দ্বন্দ্বও চোখে পড়ে। তাঁর মধ্যে এক সত্তা যেন নবীনকে স্বীকার

করছে, অপর সত্তা প্রতিবাদ করছে। এই আত্মদ্বন্দ্বই গুপ্ত কবিকে 'যুগন্ধর' করে তুলেছে। যুগের দ্বিধাচ্ছন্নতা তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে।

বস্তুত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কোনো 'message' নেই। তাঁর মধ্যে আধুনিকতার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছে তা ওই যুগেরই লক্ষণ, ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। নবীন ভাবধারার মধ্যে তিনি কোনো সৃষ্টির অঙ্কুর দেখতে পাননি, তাই তিনি নতুন কোনো পথের ইঙ্গিত দিতে পারেননি, তিনি বাঙালিকে সমস্যা সংকটের রণভূমি থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারেননি, তবে তার অপ্রকৃতিস্থ ভাবটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন— আর এখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা, তাঁর মৌলিকতা, তাঁর কৃতিত্ব।

১.৩ খণ্ডকাব্য — মহাকাব্য

উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালি জাতির জীবনে ইংরেজি সভ্যতা ও সাহিত্যের স্পর্শ এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজি শিক্ষিত ও দীক্ষিত জাতি— রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র যে জাতির মধ্যমণি, কাব্য-সাহিত্যে সেই জাতি চাইল আপনাকে সম্প্রসারিত করতে। তার প্রাণে লাগল আধুনিক জীবনোল্লাসের রঙ, আর, জীবনরস কবিদের রচনায় পঙ্কশয্যা ত্যাগ করে সায়রগামী হল। কবিতার ফর্ম এবং কনটেন্টে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল, লঘু রঙ্গ-ব্যঙ্গের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সে পৌঁছে গেল দৃঢ়পিনদ্ধ ক্লাসিক বাঁধুনির মধ্যে। আধুনিক বাংলা কবিতা মুক্তি পেল রঙ্গলাল, মদুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের হাতে, উনিশ শতকী বাঙালি রেনেসাঁসের নান্দীপাঠ করলেন এই কবি চতুষ্টয়।

বস্তুত এই চার কবির লেখায় ইংরেজি সাহিত্য-শৈলী বিমুগ্ধ জাতির আত্মপ্রসারণের তাগিদ বিমূর্ত হল। ইতিহাসের কাহিনি বর্ণনার মধ্যে আধুনিক জীবনোচিত দেশপ্রেম সঞ্চারিত করা এবং গল্প-কাহিনির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের জন্য সচেষ্ট কবিদের আমরা আখ্যানকাব্যের কবি বলতে পারি। আখ্যানকাব্যকে মহাকাব্যে উন্নীত করার প্রয়াস হেম-নবীনের মধ্যে লক্ষ করা গেলেও মধুসূদন ছাড়া আর কেউ অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য রচনা করতে পারেননি বা পাঠকের মধ্যে মহাকাব্যিক রসচেতনা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হননি। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের এক বছরের মধ্যেই পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশের মাধ্যমে পরাধীন জাতির জীবনে স্বাধীনতার আর্তি সঞ্চারিত করার যে সচেতন দায়িত্ব এই কবিরা নিয়েছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসে একথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। এবার এই কবিদের আলোচনা করা যাক।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) ঃ

ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকায় ছদ্মনামের সাহায্যে কতকগুলো বাজে কবিতা লিখে হাত পাকিয়ে ছিলেন রঙ্গলাল। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে পণ্ডিত রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের আদিরস ও ঈশ্বর গুপ্তের কৌতুকরস ছেড়ে স্কট-বায়রনের মতো ইতিহাসকে অবলম্বন

করে বীররসাত্মক আখ্যানকাব্য রচনা করলেন এবং এইভাবে মানবচেতনা গভীরতর বিষয়ে গিয়ে পৌঁছাল। রঙ্গলালের গ্রন্থতালিকা এরূপ—

(ক) পদ্মিনী উপাখ্যান (১৯৫৯)
(খ) কর্মদেবী (১৮৬২)
(গ) শূরসুন্দরী (১৮৬৮)
(ঘ) কাঞ্চি-কাবেরী (১৮৭৯)

প্রথম তিনটি কাব্যই রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে এবং 'কাঞ্চি-কাবেরী' ওড়িয়া ভক্তির উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনলেও ফর্মের ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি পংক্তির জন্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়েছিল।

রঙ্গলাল কুমারসম্ভবের কিছু অংশ অনুবাদ করেন (১৮৭২) এবং ১৮৫৮ সালে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য লিখেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩):

এতদিন ধরে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম যে কাব্যাদর্শের সঙ্গে, সমিল পয়ার ও ত্রিপদীর সেই শান্তির ঘরে বজ্রপাত ঘটালেন বাণীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে মাত্র সাত বৎসর যাঁর পদচারণা, ব্যক্তিজীবন যাঁর গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই যন্ত্রণাবহ, যিনি ইংরেজি ভাষার কবি হিসাবেই প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন, তিনি রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা। তাঁর কাব্যগ্রন্থের তালিকা—

(ক) তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)
(খ) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
(গ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)
(ঘ) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
(ঙ) চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং 'মেঘনাদবধে' তার সার্থক প্রয়োগ। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বীরবাহুর মৃত্যু থেকে মেঘনাদের হত্যা পর্যন্ত অংশ মোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত করে এতে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন মধুকবি। পুরোনোকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে রাবণকে তিনি এঁকেছেন Grand fellow রূপে। তাঁর রাবণ এক উন্নত এবং ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী, বিত্ত ও বীর্যশালী জাতির বীরাধিনায়ক, বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও বিরূপ নিয়তির চক্রান্তে যে ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়েছে; এ যেন আমাদের ভারতভূমিরই অবস্থা। বীরবাহু থেকে ভগ্নদূত, রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎ লঙ্কার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যে তুলনাহীন সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা সেকালের ভারতের মানুষকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল এবং জাতীয়তাবোধের উজ্জীবন ঘটানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। কাহিনিটিকে বিবৃতির গুণে অসামান্য মহাকাব্যিক বিস্তৃতি দান করতে পেরেছিলেন মাইকেল। হোমার, ভার্জিল, দান্তে,

মিলটন, তাসো প্রমুখ পাশ্চাত্য মহাকবিদের প্রভাব মধুকবির শিল্পাদর্শ গঠন করেছিল। অদৃষ্টের নির্মম পীড়নে রাবণ যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির হতভাগ্য নায়ক। প্রমীলাকে সৃষ্টি করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও শরিক হয়েছিলেন মধুসূদন। ব্রজাঙ্গনার বংশীধ্বনিতে যুদ্ধের ঢক্কানাদ নেই, রয়েছে লিরিক মূর্ছনা। বীরাঙ্গনা কাব্যে কবিতার Craftmanship অভিনব, ওভিদের Heryds পত্রকাব্যের আদর্শে রচিত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদন অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, কোনো কোনো সনেট ব্যক্তিক অনুভূতির স্পর্শে সকরুণ হয়ে উঠেছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ঃ

এই কাব্যধারায় হেমচন্দ্র এক শক্তিধর কবি। কিছু রোমান্টিক কাব্য রচনা করলেও যে কাব্যের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন সেটি 'বৃত্রসংহার'। এই কাব্যে মহাকাব্যের সমস্ত পূর্বশর্ত মানা হয়নি, তবুও বিষয়গৌরবে এটি পাঠক মানসে মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। মহাকবির প্রতিভা তাঁর ছিল না, বিশেষ করে অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে তাঁর হাত খুবই দুর্বল। তবে পরাজিত দেবতাদের পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা এবং স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চিত্রায়িত করে বাঙালি মানসে জাতীয়তার উদ্বোধন ঘটাতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাছাড়া ড্রাইডেন, লঙফেলো, শেলি, কিটস প্রমুখের লিরিক কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে দারুণ সাফল্য দেখিয়েছেন হেমচন্দ্র। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—

(ক) চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১)
(খ) ছায়াময়ী (১৮৭০)
(গ) আশাকানন (১৮৭৬)
(ঘ) বীরবাহু (১৮৬৪)
(ঙ) নলিনী বসন্ত (১৮৭০)
(চ) কবিতাবলী (১ম খণ্ড - ১৮৭০ ; ২য় খণ্ড-১৮৮০)
(ছ) বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড - ১৮৭৫; ২য় খণ্ড - ১৮৭৭)

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) ঃ

ইনি মূলত গীতিকবি। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমমূলক আখ্যানকাব্যের ধারায় তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' এক অভিনব সংযোজন। বাংলার বায়রন বলে কথিত এই কবি কলেজ জীবন থেকেই কবিতা লিখেছেন; কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে এসে আখ্যানকাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের উক্তির মাধ্যমে দেশপ্রেমিক কবি তাঁর অন্তরবেদনাকে সুর ও ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

নবীনচন্দ্রে রয়েছে অনুভূতির তীব্রতা, আত্মপ্রকাশের অসংযম এবং প্রচণ্ড আবেগ। মাত্র ১১৮ বৎসর আগের পলাশীর প্রাঙ্গনে বাঙালি জাতির বিশ্বাসঘাতকতার ও পরাজয়ের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, পলাশীর যুদ্ধে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই চিত্র পাঠককে বিষণ্ণ করে, আবার অনুভূতিকে চাবকে তুলে সচল করে।

রোমান্টিক স্বদেশপ্রেমের আরও টুকরো টুকরো কাব্য লিখলেও নবীনচন্দ্রের আরেক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তিনখানি পৌরাণিক আখ্যানকাব্য— রৈবতক (১৮৮৭); কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩); প্রভাস (১৮৯৬)। এই কাব্যত্রয়ীতে কৃষ্ণের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে এবং কৃষ্ণকে অবতার রূপে না দেখে শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে বিচার করা হয়েছে। নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—

(ক) রঙ্গমতী (১৮৮০)
(খ) অবকাশ রঞ্জনী (প্র. খণ্ড ১৮৭১; ২য় খণ্ড ১৮৭৮)
(গ) পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)

এছাড়াও নবীনচন্দ্র কিছু কিছু মহাপুরুষ-জীবনীকাব্য রচনা করেন।

দেখা গেল যুগের প্রয়োজনে ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনি অবলম্বন করে এতে স্বাদেশিকতা সঞ্চারের তাগিদ থেকে এই আখ্যানমূলক কাব্যধারার সৃষ্টি। এঁদের মধ্যে মধুসূদনের প্রতিভা ছিল বহুবিস্তারী এবং অসাধারণ, তার স্ফুরণও সেভাবে ঘটেছে। কিন্তু মহাকাব্যের যে ব্যাপ্তি ও রসবৈচিত্র্য তা মধুসূদন ছাড়া পরবর্তীকালের কবিরা ধরতে পারেননি। সম্ভবত এর অন্যতম কারণ গীতিরসে বাঙালির আসক্তি। মহাকাব্যের ক্লাসিক রীতি আয়ত্ব করা সত্যিই দুরূপ ব্যাপার, মধুসূদন ছাড়া কেউই তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। কিন্তু তবু রেনেসাঁসযুগের জাতীয়তাবোধের বিকাশে এই কবিদের অবদান অনস্বীকার্য এবং বাংলা কবিতার মধ্যে গতি ও বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয় এবং উচ্চাঙ্গের আর্ট-ফর্ম নিয়ে এসে আধুনিক বাংলা কবিতার যৌবন-মুক্তির ক্ষেত্রে এই চারজন কবি যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১.৪ গীতিকবিতার ধারা

উনিশ শতকের তরঙ্গক্ষুব্ধ দিনগুলিতে নবজাগ্রত বাঙালি মানস সাহিত্য-শিল্প ক্ষেত্রে নানাভাবে আপনাকে প্রকাশের ব্যাকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। বিগত শতকের কবিগান তর্জা আর এরই অনুবৃত্তিতে ঈশ্বর গুপ্তীয় আদিরসাত্মক কাব্যের গণ্ডি ছেড়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্য কবিতায় অনন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ করা গেল। বীররসাত্মক খণ্ডকাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে আধুনিক বাঙালি মানস তার নিজের পরাধীন চেহারাটাকেই অনুসরণ করেছিল, পাশাপাশি ছড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতার গভীর আর্তি। কিন্তু চর্যাপদের যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে যে গীতিপ্রাণ জাতির প্রকাশ আমরা লক্ষ করি, তাদের পক্ষে Classic কাব্যের দৃঢ়-কঠিন ফর্ম মেনে চলা সম্ভব ছিল না। বীররসের মহাকাব্যে তাই অশোকবনের বর্ণনায় স্বপ্নলোক গড়ে ওঠে। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা দেশ-কাল-ইতিহাসের সংকট বর্ণনায় বাঙালির মন তৃপ্ত হল না, শুরু হল তার একান্তে, নিভৃতে, নিজের মনে নিজের সুরে গান গাওয়া। এভাবেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উদ্ভব।

একারণেই 'আধুনিক' যে, এসময়েই প্রথম কবির ব্যক্তিক অনুভূতির একান্ত মন্ময় আত্মপ্রকাশ, যা কিনা 'Profoundly With the Poet himself'. চণ্ডীদাসকে নিজের কথা বলতে হয়েছিল রাধার জবানিতে, চর্যার কবিকে তন্ত্রের গানে, কিন্তু গীতিকবিতা— হচ্ছে 'Expression of Poets own feelings', যাতে থাকবে রোমান্সের 'extra ordinary development of imaginative sensibility'. বিহারীলালের মধ্যেই প্রথম এই একান্ত

ব্যক্তিগত ভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বিহারীলাল আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদি গঙ্গা ভগীরথ। তাঁর রচনায় প্রাণের যে স্বতস্ফূর্ত উল্লাস, অপার্থিব অপ্রাপ্তির অনির্বচনীয় বিষাদ, প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান লক্ষ করি— এই প্রবণতাগুলিই অন্তত তিনটি দশক পরে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের হাতে পেয়েছে সংহতি ঋদ্ধি ও সাফল্য। এবার আমরা রবীন্দ্র পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রধান কবিদের মূল কাব্যপ্রবণতাগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে অনুসন্ধান করব।

১.৪.১ রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিসমাজ

বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪) থেকেই বাংলা কাব্যের পালাবদল শুরু হল। মহাকাব্যের রণরঙ্গমুখর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে এই কবির অন্তর্লোকই প্রথম সুদূরের অভিসারে যাত্রা করল। এই পথেই বিহারীলালের অনুসরণ করেছেন উনিশ শতকের কবিরা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ঋণ স্বীকার করে তাঁকে বাংলা কাব্য-কাননের ভোরের পাখি আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের তালিকা এরূপ ঃ

(১) সঙ্গীত শতক	(১৮৬২)
(২) বঙ্গসুন্দরী	(১৮৭০)
(৩) নিসর্গসন্দর্শন	(১৮৭০)
(৪) বন্ধুবিয়োগ	(১৮৭০)
(৫) প্রেমপ্রবাহিণী	(১৮৭১)
(৬) সারদামঙ্গল	(১৮৭৯)
(৭) সাধের আসন	(১৮৮৮)
(৮) বাউল বিংশতি	(১৯২৪)

বিহারীলাল জড় প্রকৃতিকে পৃথক ব্যক্তিত্ব দিয়ে তার সঙ্গে কবি-প্রাণের লীলা-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, বাস্তবের পাষাণপুরী ত্যাগ করে শ্যামতৃণ তরুরাজির মধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে গৃহচারিণী নারীকে তিনি অধিষ্ঠিত করেছেন সৌন্দর্যের স্বপ্নলোকে। নারীর রোমান্টিক ও Ideal মূর্তির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় বিহারীলালের দান।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কাব্যের নায়িকা অতীন্দ্রিয় লোকের অধিবাসী এক সৌন্দর্যময় - ভাবময় সত্তা, বিশ্বের তিল তিল সুষমা আহরণ করে রোমান্টিক কবি তাঁর মানসী প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। ইনি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইনিই কবির কাব্যের প্রেরণা, বাল্মীকির কণ্ঠে ভাষা ও সুর দেন এই সারদা, বিচিত্র প্রাকৃতিক পটভূমিকায় কখনও বা আকাশ জুড়ে ত্রিশুল হাতে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন, এই সারদা হোমারের Muse, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কিংবা মানসসুন্দরী, Shelly-র Intelectual beauty কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসির সমগোত্রীয়া। ইনি দেবী অথচ মানবী, কবির সাধনার ধন, অথচ তাঁর সঙ্গেই কবির মান অভিমানের সম্পর্ক। অতীন্দ্রিয় রূপের অনুভবগম্য এই নারী ঘনঘন রূপ বদলে পাঠকের কাছে মিস্টিক হয়ে উঠেছেন। তবে এই কাব্যটিতে সংহতির কিছু অভাব আছে। 'সাধের আসন' কাব্যে কাদম্বরী দেবীর প্রশ্নের জবাবে সারদার রূপক-ব্যাখ্যা আছে, ব্যাখ্যাটি যতটুকু তত্ত্ব, ততটুকু কাব্য নয়।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-১৮৭৮) রচনায় রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের চেয়ে ক্লাসিক ঘনত্বই বেশি। তিনি প্রথম দিকে ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে কাব্য লেখার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবে তাঁর পত্নীবিয়োগের পর রচিত 'মহিলা' কাব্যে যথার্থ গীতিকবিতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর আদর্শে তিনি নারীর জননী, জায়া, ভগিনী, দুহিতা এই চার মূর্তি সম্বন্ধে কাব্য লেখার পরিকল্পনা করেন। কবির আকস্মিক মৃত্যুতে কাব্যগ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই গ্রন্থে এক সুনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষের সম্পর্ক বিচার করা হয়েছে। রোমান্টিক স্বপ্নাভিসার ও মিস্টিক আত্মলীনতা নয়, নারীর গৃহচারিণী মূর্তিই তাঁর ধ্যেয়। আবেশের উচ্ছ্বাসে সঙ্গীরা যখন ভাসছেন, এই কবি করেছেন আবেগ ও মননের সমন্বয়সাধন। তাই তাঁর রচনায় একই সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাবেগ ও Classic ঘনত্ব ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রধান সৃষ্টিগুলি হল—

(১) ষড়ধাতু বর্ণন (১৮৫১)
(২) সবিতা সুদর্শন (১৮৭০)
(৩) মহিলা (১৮৮০)

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ১৯২০) রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় হলেও বিহারীলাল-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর গীতিরসসিক্ত মন মধুসূদনের ভাষাভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতি, প্রেম, নারী, সৌন্দর্য ইত্যাদি রোমান্টিক উপাদানের পাশাপাশি প্রত্যহের সংসার জীবনও তাঁকে যুগপৎ আকর্ষণ করত। তবে রোমান্টিক কবিদের মতো একটা কৃত্রিম ব্যর্থতার বিষণ্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে নিজেকে সঁপে দেননি তিনি। সুইনবার্নের (Swinburne) দাহ তাঁর মধ্যে নেই; কিন্তু আছে ইন্দ্রিয়গম্য সৌন্দর্যরসের প্রতি লোভ, যা রূপসৃষ্ট—

"চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপবৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী আনন্দে নেহারি।"

তিনি শিশুবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন যাতে সরল প্রাণের হাসির ছবি রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ কিছু ভালো সনেটও লিখেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির তালিকা—

(১) উর্মিলা কাব্য (১৮৮১)
(২) নির্ঝরিণী (১৮৮১)
(৩) অশোকগুচ্ছ (১৯০০)
(৪) গোলাপগুচ্ছ (১৯১২)
(৫) অপূর্ব নৈবেদ্য (১৯১২)
(৬) অপূর্ব বীরাঙ্গনা (১৯১২)
(৭) অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) রবীন্দ্র সমসাময়িক, সে যুগের অন্যতম খ্যাতিমান গীতিকবি। বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর কবিমনের স্বাধর্ম লক্ষ করা যায়। প্রকৃতি,

সৌন্দর্য ও প্রেম— এই তিন উপাদানে তাঁর কাব্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। নিসর্গের বিষণ্ণ মাধুরী বর্ষার ধারাস্নাত অলস অপরাহ্ন ইত্যাদি বর্ণনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ—

(১) প্রদীপ (১৮৮৪)
(২) কনকাঞ্জলি (১৮৮৫) এবং
(৩) ভুল (১৮৮৭)

তিনটি গ্রন্থেই প্রেম সম্পর্কে কবির মনোভাব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রেম মর্ত-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। তাঁর মানসী অধরা, অপ্রাপণীয়। তিনি শেলি-কিটসের পথ ধরে ইন্দ্রিয়কে বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 'ভুল' এবং পরবর্তীতে 'শঙ্খ' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থে বাস্তবজীবনের মধ্যেই প্রেমের অনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন কবি।

অক্ষয়কুমারের শেষ ও শ্রেষ্ঠতম কাব্য 'এষা' (১৯১২) বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য শোককাব্য। পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত কবি সহসা যেন জেগে উঠলেন, মৃত্যুর আলোতে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন "মরণে কি মরে প্রেম, অনলে কি পোড়ে প্রাণ?" মানুষের সত্তা কি চিতাধূমের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়? এই প্রশ্ন, অস্তি ও নাস্তির দোলা শেষে টেনিসনের মতো এক নির্বেদ বৈরাগ্যের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন আমাদের কবি। অক্ষয়কুমার ছন্দ ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে বেহিসাবি ছিলেন, ভাবাবেগের তারল্যও অনেকগুলি কবিতার সর্বনাশ করেছে।

এই কজন কবি ছাড়াও উনিশ শতকের গীতিকবিদের মধ্যে ভাওয়ালের দেহানুরাগী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, হরিশচন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

এই সময়ে গীতিকাব্য আখ্যানকাব্যে কয়েকজন মহিলা কবিও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায় উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস ও কামিনী রায়ের কবিতা বেশ ভালো, স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশও রাখে। পরিশেষে বলা যায় উনিশ শতকের এক সন্ধিলগ্নে বাংলা গীতিকবিতায় এই সব খ্যাত-অখ্যাত কবিরা বাংলা কাব্যের প্রকৃত পথসন্ধান করেছিলেন আর এ পথেই রবীন্দ্রনাথ এসে বাংলা কাব্যকে বিশ্ববরেণ্য মর্যাদা দিয়েছেন।

১.৪.২ রবীন্দ্র কাব্য

অন্যূন আটষট্টি বছরের সাহিত্যসাধনায় বিশ্ববৃত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির সকল প্রকোষ্ঠ আপন প্রতিভার হিরন্ময় দ্যুতিতে আলোকিত করেছেন; একাধারে তিনি কবি, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যতাত্ত্বিক, নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নন্দনতাত্ত্বিক, সমালোচক, চিত্রকর, অভিনেতা, সমাজতাত্ত্বিকও বটে। রোমান্সের পরমহংস হয়েও চোখ ফিরিয়ে নেননি দেশকালের সুবৃহৎ পরিসর থেকে; সভ্যতার সংকটে পীড়িত হয়ে মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন বজ্রকণ্ঠে, প্রত্যাখান করেছেন কলোনি শাসকের দেওয়া সম্মান, আর মানবসম্পদের সুযোগ্য বিকাশের লক্ষ্যে গড় তুলেছেন শান্তিনিকেতন। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক হলেও, বিশ্ববাসীর কাছে প্রধানত তিনি কবি হিসাবেই পরিচিত ও

অর্চিত। দু-হাজারেরও বেশি কবিতা লিখেছেন তিনি, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা, তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে একটা নিটোল ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। দুধ, আমসত্ত্ব, কলা, সন্দেশ-এর জোড়াসাঁকো ঘরানার চমৎকার ফলারাদির বিবৃতির মাধ্যমে আত্মনির্মাণ ও আত্মসন্ধানের যে পালা শুরু হয়েছিল, রূপনারানের কূলে আশি বছর পেরিয়ে এসে আপনার বন্ধমুক্ত চৈতন্য আবিষ্কারের মধ্যে সে পালা সাঙ্গ হল। এই দীর্ঘ যাত্রার কোনো সৃষ্টিই একক কিম্বা বিচ্ছিন্ন নয়, স্তর থেকে স্তরান্তরে, ভাব থেকে ভাব্যন্তরে উত্তরণটি স্পষ্টভাবেই অনুভবগম্য। শুধু কবিতা নয়, কবির জীবনদেবতা তাঁর সৃষ্টির সূত্রে কবির জীবনকেও গেঁথে তুলেছেন, পথের বাঁকগুলো বড়ো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাই।

রবীন্দ্রকাব্যসাধনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে, প্রায় সকল আলোচকই ভাবানুগ কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন তাঁর বিশাল সৃষ্টিশালাকে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা মোটামুটিভাবে সেই বিভাগ স্বীকার করে নিচ্ছি আলোচনার সুবিধার্থে।

অপ্রকাশের কাল ঃ

ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও সাহিত্যচর্চার পরম্পরা দেবেন্দ্রনাথের ত্রয়োদশ সন্তানের কাব্যচর্চার সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছিল। 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' জাতীয় লেখাতে যে সম্ভাবনা লক্ষ করা গেল, তাই ক্রমশ সংহত হল পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল প্রমুখের অনুসরণে লিখিত 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' জাতীয় লেখায়। প্রকাশের সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই ওই ধরনের লেখায় স্পষ্ট হয়নি।

উন্মেষ পর্ব ঃ

কিন্তু ক্রমশ বিশ্বপ্রকৃতি তার রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে আর মানুষ তার প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কিশোর কবির সামনে এসে দাঁড়াল। ভৃত্যদের অধীনে বাল্যের বন্দীদশা কাটানোর সময়েই বাইরের ডাক তাঁকে উতলা করেছিল, আজ হৃদয়ের আগলখানি শুভলগ্নে খুলে গেল যখন তখন জগৎ এসে এখানে 'কোলাকুলি' শুরু করল। অসীমের পরশ পেয়ে প্রকাশের তাগিদাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' (১৮৮২) যে আবেগের উন্মেষ, 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩) 'স্বপ্নভঙ্গে বিচিত্র প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে তারই বিস্তার।

'আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণকারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।'

—সৃষ্টির এই অধীর আবেগ শান্ত সংহত হওয়ার আগেই বেরিয়ে এল 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) কাব্য। মানবের সাধারণ সুখদুঃখ ও প্রকৃতিবন্দনা তখনও শিল্পের সীমায় পৌঁছায়নি। পরবর্তী কাব্য 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)-এ একটা অধ্যায় শেষ হল,

'কাব্যভূসংস্থানে' জেগে উঠল ডাঙা। ভরা যৌবনে ইন্দ্রিয়ের উল্লাস, প্রেম ও সৌন্দর্যের সম্ভোগের পাশাপাশি ভোগাতীতের সন্ধানের একটা অস্পষ্ট সঙ্কেত পাওয়া গেল এখানে।

ঐশ্বর্য পর্ব ঃ

'কড়ি ও কোমল' থেকেই সীমা ও রূপের এবং অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের গণ্ডি অতিক্রমী এক অখণ্ড অসীম রূপাতীত সৌন্দর্য-সত্তা ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। রোমান্টিক কবি 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) জুড়ে এই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যেরই উপাসনা করলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্যকে তিলে তিলে আহরণ করে 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' যে মানসী প্রতিমা গড়ে তুললেন তার সঙ্গে শুরু হল মান-অভিমানের এক অপরূপ লীলা। এই লীলাসূত্রে রবীন্দ্রকবিতায় এল সুমন্নত কল্পনার ঘনবদ্ধ সংহতি। এই মানসী যে ভোগের সামগ্রী নন 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সেই উপলব্ধির প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ। অতঃপর 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা'-য় এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকেই দেখি 'মানসসুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'চিত্রা', 'বিজয়িনী', 'উর্বশী' ইত্যাদি কবিতায়। ইনি জাগতিক সৌন্দর্যের নির্যাস, কেবল তৃষিত করেন, তৃপ্ত করেন না, ভোগের বৃন্তে পাওয়া যায় না তাঁকে, মূর্তিতে ধরা যায় না তাঁকে। কিন্তু মূর্তি তাই বলে প্রত্যাখ্যাত হয় না রবীন্দ্র চেতনায়। সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন পূর্ণ ভালোবাসাও যে মর্তভূমিকে স্বর্গাদপি মধুর করে তোলে, কবি ভুলে যান না তা। 'যেতে নাহি দিব', 'প্রেমের অভিষেক', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'সান্ত্বনা', 'রাত্রে ও প্রভাতে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' জাতীয় কবিতায় গৃহকল্যাণীকেই বন্দনা করেন কবি। এই পর্বে রবীন্দ্রকল্পনা প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্মতার নিবিড় অনুভবে বিধুর। ওই সময়ে লেখা ছিন্ন পত্রের চিঠিগুলিতে পৃথিবীর প্রতি যে নাড়ির টান অনুভবের কথা বলেন কবি, 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'চিত্রা'র 'জ্যোৎস্নারাতে' ইত্যাদি কবিতায় তারই অভিব্যক্তি লক্ষ করি। কাব্যসাধনার এই স্তরে জগতে বিচিত্র রূপিণী, অন্তরে একাকী যে সত্তাকে উপলব্ধি করেন কবি, তাকে তিনি কাব্যে ও জীবনের ঐক্যসূত্রধার হিসাবে আখ্যায়িত করে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছেন।

অন্তর্বর্তী পর্ব ঃ

'চৈতালী' (১৮৯৬)-তে প্রেম-সৌন্দর্যসম্ভোগ ও প্রকৃতি সান্নিধ্যের উল্লাস ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল, কবির মনোবিহঙ্গ এক নতুন পথে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রতিভার ধর্মই তো নব নব উন্মেষশালিতা। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারতের দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন, কালিদাসের কালের ঐশ্বর্য তাঁকে দোলা দিয়েছে। মূলত 'কল্পনা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৯০১) 'খেয়া' (১৯০৬) এই কাব্যত্রয়ে কবিচেতনার উত্তরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'দুঃসময়' কবিতায় যে অভিযাত্রী পাখির কথা বলা হল, সে এসে পৌঁছেছিল 'কালিদাসের কালে'। প্রাচীন ভারতের জীবনসাধনা ও ধর্মচেতনা কবি যেভাবে অনুধাবন করলেন নৈবেদ্যতে তারই প্রকাশ। 'খেয়া'-য় যখন উত্তীর্ণ হলেন কবি, তখন তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্মচেতনা ক্রমশ সংহত হচ্ছে। এরই মধ্যে কবির স্ত্রী, পিতা ও কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হল। এই মৃত্যু প্রিয়জনকে কেবল ছিনিয়ে নিল না, বিশ্বময় ছড়িয়েও দিল। রুদ্রবেশে

ঝড়ের রাতে ঘরে এলেন দেবতা; আঘাত দিয়ে নিজেকে চেনালেন। রূপের নেশা ঘুচিয়ে দিয়ে অরূপরতন কবিকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন জগতের আনন্দ যজ্ঞে। সেখানে নিবিড় করে পেলেন 'পরাণসখা বন্ধু'কে , শুরু হল আরেক পালা। ইতিমধ্যে পত্নীর স্মৃতিতে লিখেছেন সকরুণ স্মরণ কাব্য (১৯০২)।

গীতাঞ্জলি পর্ব ঃ

খেয়ার কবি যে পরাণসখার মুখোমুখি হলেন, 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্যত্রয়ে তারই সাথে কবির মিলনলীলা। গীতাঞ্জলিতে দূরত্ব ঘোচেনি, বন্ধু বলে দুহাত ধরা হয়নি, গীতিমাল্যতে 'কোলাহল তো বারণ হল'; শুরু হল 'কানে কানে' কথা বলা। জীবনের সকল ভাব-চিন্তা অনুভূতি সবই যে অরূপরতনের লীলা, এই বোধটি নিবিড় হয়ে উঠল- 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে। /তাই তো আমি এসেছি এই ভবে'। আমার মধ্যে যে তাঁরই প্রকাশ, সেই প্রিয়তমের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন কবি। আনন্দগান গেয়ে বরণ করলেন তাকে, বললেন, — 'আমার চির জীবনেরে/লও গো তুমি লওগো কেড়ে/একটি নিবিড় নিমিষে।।" গীতালিতে এসে মিশল পথে চলার আবেগ, কেননা, ধূলিময় পৃথিবীর পথেই যে সবাইকে নিয়ে সকলের বৃত্ত ছেড়ে, কবি এবার বিশ্বপিতাকে পেতে চাইলেন 'দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।' কবি দেখলেন, চির পথিকবেশী দেবতার আত্মবিকাশের গতির সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে সৃষ্টি। নিভৃতি ছেড়ে চরৈবেতি মন্ত্রের উত্তরসাধক কবি চলাকেই সত্য বলে মেনে নিলেন।

বলাকা পর্ব ঃ

এভাবেই কবি পৌঁছালেন বলাকার (১৯১৬) চলমানতায়। দুঃখ সুখের পৃথিবীতে আবার এসেছেন কবি। পথ চলতে চলতেই জানলেন একটা অনিবার্য সত্য-কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।' তাই বলে কি বসে থাকবেন কবি? না, যাওয়ার কথাটি যেই মনে এল কাজের তাগিদও বাড়ল। পৃথিবীতে ভালোবাসার আশ মেটেনি যে কবির। পলাতকা-পূরবী-মহুয়া-বনবাণী-পরিশেষ কাব্য জুড়ে ভালোবাসাবাসিরই কথা। এরই মধ্যে গদ্যছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ করি 'লিপিকা' (১৯২২)-র কবিতাগুলিতে।

শেষসপ্তক পর্ব ঃ

'পুনশ্চ' (১৯৩২) থেকে 'শ্যামলী' (১৯৩৫) পর্যন্ত পাঁচ বছর জুড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যতটুকু মনযোগী তার চেয়ে নাটকে প্রবন্ধে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। কবিতার আঙ্গিকে ইতিমধ্যে পরিবর্তন এসেছে, আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনিও সঞ্চারিত হয়েছে কবিতায়। এরই মধ্যে 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা), 'শঙ্খ' (বলাকা) 'প্রশ্ন' (পরিশেষ) ইত্যাদি কবিতায় মানবতার লাঞ্ছনার প্রতিবাদে কবির যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল,

তা ক্রমশ প্রধান স্থান জুড়ে নিতে লাগল বৃদ্ধ কবির লেখায়। পাশাপাশি সন্ন্যাসের দীক্ষা নেওয়ার তাগিদও লক্ষনীয় ভাবে ধরা পড়ল। এই পর্বের ঔপনিষদিক উত্তরাধিকার কবির মধ্যে আরো স্পষ্ট হল শেষ পর্যায়ের কাব্যে।

শেষপর্ব ঃ

'প্রান্তিক থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত মোট ১০ টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় চার বছরে। চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য পরিহার করে এই পর্বের কবিতায় এসেছে একটা directness. কবি নিজেই বলেন, এ জীবনের প্রৌঢ় ঋতুর ফসল আর 'পৌষ' ঋতুর ফসলে নাই মন ভোলানোর দায়। 'স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যে'র প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে কবির একা যাত্রা শুরু হল অনন্তের পথে। রূপ ছেড়ে বলাকার অভিযাত্রী রওয়ানা হলেন স্বরূপের পথে, নিরাসক্ত শান্তিতে পরিপূর্ণ মনে। 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯) 'সেঁজুতি' (১৯৩৯) 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' হয়ে 'জন্মদিনে' পৌঁছে কবি বলেন—

"প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি, পাই যদি দেখা।"

অবশেষে দেখা পেলেন সেই সত্তার, রূপনারানের কুলে এসে। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে লেখা কবিতায় কবি জানালেন—

"চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,"

আপনাকে চেনা যখন হল, তখনই, বলা বাহুল্য, প্রয়োজন ফুরাল এ জন্মের। অস্তমিত হল রবি, বাংলা সাহিত্যেও হল যুগাবসান। কিন্তু যুগাবসানের আগে, কবীন্দ্র রবীন্দ্র অর্থগৃধু রাজ্যলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতিকে ধিকৃত করে গেছেন 'প্রান্তিক' থেকে 'জন্মদিনে'র নানা লেখায়। আর অবহেলিত শ্রমিক কৃষকদের প্রতি ব্যক্ত করেছেন সুগভীর সহমর্মিতা। প্রথম পর্বের ভাব বিভোরতায় যাদের দেখা হয়নি, মেশা হয়নি যাদের সঙ্গে, শেষের দিনগুলিতে কবি তাদেরই জানিয়ে গেলেন 'আমি তোমাদেরই লোক'। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের; কোনো শ্রেণি কিম্বা সম্প্রদায়ের নন। সকলকেই তিনি যেন বলেন— 'আমি তোমাদেরই লোক'— এখানেই কবির সম্পূর্ণ পরিচয়।

১.৪.৩রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব যেমন বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতিকে অন্ধকারের শেষে অত্যুজ্জ্বল আলোর দিশা দেখিয়েছিল, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিল সম্মানের আসন; তেমনি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বিচরণকারী রবীন্দ্র সমসাময়িক অপরাপর লেখক-কবির মনন মানসিকতাও রবি-কবির কাব্য-প্রভাবে দুভাবে আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্রবিদুষণ এই দুই ধারাই সমান সক্রিয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে, বিশেষত সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

পাবার পর রবীন্দ্র প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাঙালির সাহিত্য-জীবন, সংস্কৃতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করেছে, তাদের জীবনকে দিয়েছে নবতর মূল্যবোধ। অবশ্য এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রপ্রভাব ছেড়ে নতুন পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষাও সেসময় একদল কবি লেখককে প্রাণিত করেছিল। অপরদিকে ওই সময়ই রবীন্দ্রসাহিত্য, আদর্শ নিয়ে প্রতিকূল সমালোচনা তথা দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন,— শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথকে অপদস্থ করার জন্য 'আনন্দবিদায়' নামে বিদ্রূপপূর্ণ নাটক লিখে তার অভিনয় করাতে গিয়ে নিজেই সকলের কাছে নিন্দিত হয়েছিলেন।

১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর নব্য হিন্দুধর্মের প্রচারক তাঁর সে সব উগ্র শিষ্য সম্প্রদায় ছিলেন তাঁরা অনেকেই রবীন্দ্র সাহিত্যের সমর্থক ছিলেন না। কেননা রবীন্দ্র-রচনা এমন একটা সূক্ষ্ম মানসিক অনুশীলন ও স্থিতধী চেতনা-রসের বস্তু যে, যুদ্ধংদেহী মন নিয়ে পাঠকের পক্ষে তার গহনে প্রবেশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। কাজেই সে সময় রবীন্দ্র সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সমাজের মুষ্টিমেয় পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর যখন সর্ব-সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা গেল তখনও একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি রবীন্দ্র বিরোধে মত্ত ছিলেন। অবশ্য এই বিরোধ ব্যক্তিগত নয়— তা সাহিত্যদর্শ কেন্দ্রিক। যেমন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেক নবীন লেখকেরা বলতে লাগলেন যে রবীন্দ্র সাহিত্য যথেষ্ট বাস্তব নয় এবং তাতে যুগ যন্ত্রণার চিত্রায়ন নেই। রবীন্দ্রনাথকেও এঁদের কারো কারো সঙ্গে সাহিত্য-বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল একপ্রকার বাধ্য হয়েই।

পাশাপাশি মানসী, ভারতী, প্রবাসী, এবং সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় কবি সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। আবার কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় নব্য ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে রবীন্দ্র পক্ষছায়া ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যে নবীনতা ও প্রগতির বার্তা সাড়ম্বরে ঘোষিত হল।

সে যাই হোক, ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে তিনস্তরের কবিকুল প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রথম স্তরে— উনিশ শতকের শেষভাগের কবিরা অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রমুখ।

দ্বিতীয় স্তরে— যেই সব কবিরা; যাঁদের রবীন্দ্রানুসারী কবি বলা হয়। যেমন— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সতীশচন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, কাজি নজরুল ইস্‌লাম প্রমুখ।

তৃতীয় স্তরে— কল্লোল গোষ্ঠী ও পরবর্তীকালের সাম্প্রতিক কবিদল। এই রবীন্দ্র প্রভাব অতিক্রমী কবি সমাজের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ প্রধান। এই কবিগোষ্ঠী কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, উত্তরা, পরিচয়, কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বারো বছরে একটি নতুন কাব্যধারা ও দর্শনের সৃষ্টি করেছেন। এই

সময় থেকেই বাংলা কাব্যের ভাব ও বিষয় প্রকৃতরূপে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়ে নতুনের পদধ্বনি ঘোষণা করেছে।

তবুও বলা যায় রবীন্দ্রনাথের দূর বিস্তারী প্রভাব রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্র বিরোধী আধুনিক কবিরা কেউই অতিক্রম করতে পারেননি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন— "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সক্রিয় তথা সর্বতোমুখ সাহিত্যিক বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জন্মায়নি; এবং পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যে সুদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে যে কবি-সমাজের অভ্যুদয় হয়েছিল বিশ-শতকের গোড়ায়, যাঁরা কবিগুরুর দীপবর্তিকা থেকেই কাব্যালোক জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন এবং ভাব-বস্তু, প্রকাশ-ভঙ্গিমা— সবদিক থেকেই যাঁরা রবীন্দ্র বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁদেরই বাংলা সাহিত্যে বলা হয় রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ। রবীন্দ্রানুসরণেই এঁদের সার্থকতা। আবার এই রবীন্দ্রানুসারী কবি বলয়ের অন্তর্গত তিনজন কবিই কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন এবং এঁদের কাছেই পরবর্তীকালের প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা বিদ্রোহের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই তিনজন কবি হলেন— মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কাজেই রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের সার্থকতা ও ব্যর্থতা, অগ্রগতি ও পশ্চাতগতি, আত্মসমর্পণ ও পরাজয় বাংলা আধুনিক কবিতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে অনেকটাই। তাই বাংলা কবিতার ইতিহাসে এঁদের অবস্থানের আলোচনা এত প্রাসঙ্গিক।

মোটামুটিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে পঁচিশ বছর অর্থাৎ ১৯১৪-৩৯-খ্রিস্টাব্দ; —এই সময়সীমাতেই 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'সুপ্রভাত', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ তাঁদের কাব্যসাধনা করেছেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের কাব্য কবিতার প্রধান শর্ত হল, দেশের গ্রামজীবন, লোকসংস্কৃতি ও পুরাণ-কাহিনির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে— আধুনিক জীবনের সংশয়, বিক্ষোভ, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা— এঁদের কবিতায় অন্বেষণ করা চলবে না। এঁরা কাব্যক্ষেত্রে চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষাকারী, এঁদের কাব্য-ভূগোল-পরিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। বিশ শতকের প্রখর সূর্যালোকেও বৈষ্ণবযুগের ছায়া-ভরা স্নিগ্ধ পরিবেশ এই কবিসমাজ রচনা করেছেন। কাজেই প্রবল রবীন্দ্র প্রভাবের মাধ্যমে এঁদের কবিতায় ঐতিহ্যপ্রীতি তথা প্রাচীন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনপ্রীতি বজায় আছে। রবীন্দ্রানুসারী এই কবিসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রাচীন কাব্যধারার মধ্যে নবীনত্বের উদঘাটন।
(খ) প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন।
(গ) সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ধারাকে সংবেদনশীলতা ও চরিত্রদান।
(ঘ) গ্রামজীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতার প্রকাশ।

এরই সঙ্গে রবীন্দ্রানুসরণে ঐতিহ্যপ্রীতি যেমন দেখা গেল তেমনি বিদেশি সাহিত্য পাঠেও এঁরা রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিদলের দ্বারাই সমধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই গোষ্ঠীর খুব কম কবির মধ্যেই সমকালীন সমাজচেতনা লক্ষ করা যায়। নগর-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা, ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন এঁদের শ্রবণে পৌঁছয়নি। একে অবশ্য 'পলায়নী মনোবৃত্তি' বলা যাবে না— বরং রবীন্দ্রানুসরণের ফলে রবীন্দ্রকাব্যে এঁরা যে অক্ষয় শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন, তা বাস্তব প্রতিবেশে সমর্থিত হবে না,— এই আশঙ্কাতেই বোধ করি এঁরা গ্রামজীবনে ফিরে গিয়েছিলেন।

অবশ্য এঁদেরই মধ্যে সমকালীন সমাজচেতনা যে কয়েকজনের কবিতায় দেখা যায়, তাঁরাই আধুনিক কবিতার অগ্রদূত। কাব্যক্ষেত্রে যে, দিনবদলের পালা এসেছে তা এঁদের কবিতায় বোঝা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সেবা-মান-ইজ্জতের জন্য', 'জাতির পাঁতি', 'শুদ্র', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতায়; মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথের মানবতা বন্দনায় এই নতুন যুগের পালা-বদল স্পষ্ট ধ্বনিত হতে শোনা গেল— যার প্রভাব পরবর্তী কবিকুলকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ হল— আস্তিকতাবোধ, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তিতে বিশ্বাস। এঁদের কবি-মানসিকতার চরিত্র নির্ণয় করলে আমরা দেখব এঁরা এমন একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়েছেন যাকে নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেননি। কাব্য-কলার প্রতি গভীর মমতা ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর প্রীতি ও সম্ভ্রমবোধ, রবীন্দ্রকাব্যের জীবন, প্রেম ও শান্তির অক্ষয় অধিকারের বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধের উপর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবোধ এই কয়েকটি লক্ষণ এঁদের কবিতায়ও বর্তমান। এখানে এঁরা একই সরণির পথিক।

রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ রবীন্দ্র প্রভাবে বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। আপত্তি উঠতে পারে নজরুল, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কিন্তু গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের বিদ্রোহ রবীন্দ্র-প্রণতিরই নামান্তরমাত্র। নজরুলের যে বিদ্রোহ, তা রোমান্টিক বিদ্রোহ। যৌবনের যে জয়গান নজরুল গেয়েছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য বন্দনার মিল রয়েছে। 'বলাকা' কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতার সঙ্গে নজরুলের 'দুর্বার যৌবন' কবিতার মিল সহজেই ধরা পড়ে। আর নজরুলের প্রেম-চেতনাও মূলত রবীন্দ্রানুসারী।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের মানসিকতা ভিন্নতর। বস্তুত এই দুই কবিকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রানুসারী কবি বলা যায় না। তীক্ষ্ণ যুক্তি-তর্ক প্রবণতা, মানবসুলভ অনুভূতিকে প্রাধান্য দান প্রভৃতি আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণগুলি উভয়ের কাব্যেই পরিস্ফুট। তবে দুজনেই কাব্যরূপ ও কলাবিধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। বাস্তবাতীত মহত্তর সত্তার আভাস, বাস্তবের আড়ালে তাঁরা সমগ্র কাব্য-জীবনে অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই মতো। কিন্তু এই রবীন্দ্রনুসারী কবিসমাজের হাতে কবিতার ভাবসম্পদ ও শব্দসম্পদ যখন অতিলালিত্য ও অতিব্যবহারে মাধুর্য হারাচ্ছিল; প্রেরণা নিঃশেষিত হয়ে আসছিল, —তখনই দেখা মিলল আধুনিক কবিতার। অলংকৃত, আড়ম্বরপূর্ণ কাব্য-প্রসাধনে ও

ছন্দোলালিত্যে অনীহা এবং বাক্ সর্বস্বতায় অশ্রদ্ধা নিয়ে আধুনিক কবিরা এলেন এবং এঁদের আগমনের ভূমিকা রচিত হল প্রধানত রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ব্যর্থতায়। আবার এই রূপান্তর সাধনে সাহায্য করেছেন, এই গোষ্ঠীরই প্রধান তিন কবি— নজরুল, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ।

কল্লোল (১৯২৩), উত্তরা (১৯২৫), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি ইত্যাদি পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে যে আধুনিক কবিসমাজের আবির্ভাব এঁরা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী। এঁরা ইহবাদীও বটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংশয় ও নৈরাশ্য এঁদের কাব্যজীবনের সূচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে, পরে তা বক্র কটাক্ষ সমন্বিত জীবনদর্শনে পরিণতি লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, সমর, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের কাব্যে এই নতুন জীবনবোধের পরিচয় পাই বিশ শতকের তৃতীয় দশকেই। এখানেই বাংলা কাব্যে পালাবদল সূচিত হল। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের রবীন্দ্র ঐতিহ্যাশ্রয় এই পালাবদলকে ত্বরান্বিত করেছে।

১.৫ সংক্ষিপ্ত টীকা

উদভ্রান্ত প্রেম ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে তাঁর একদল শিষ্য বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এঁদের এনেকে ছিলেন বঙ্কিমের অনুরক্ত শিষ্য, অনেকে ছিলেন সহকর্মী। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও বঙ্কিমের ভাবমণ্ডলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক সময়ে তিনি প্রায় বঙ্কিমের তুল্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

'উদভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। এটি গদ্যকাব্য জাতীয় রচনা। শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকেও উদভ্রান্ত প্রেম যুবসমাজে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি উচ্ছ্বসিত করুণরসপ্রধান রচনা, এর ভাষাভঙ্গি আবেগ-ব্যাকুল, এর ফলশ্রুতি নির্বেদ বৈরাগ্য। স্ত্রীর মৃত্যুর পর উদভ্রান্তচিত্ত চন্দ্রশেখর এই গদ্যকাব্য রচনা করেন। এর বহু অংশ একসময়ে সহৃদয় পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল। এতে আন্তরিকতা, আবেগ ও অতিনাটকীয় চমৎকারিত্ব থাকলেও এর বহু অংশই শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাই সমকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও প্রকৃত সাহিত্যগুণের অভাবে পরবর্তীকালে এটি তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

স্বপ্নপ্রয়াণ/দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের বড়দা অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা ছিল সর্বব্যাপী। তিনি ছিলেন কবি, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর, গণিতজ্ঞ, তত্ত্ববিদ, দার্শনিক—

ইত্যাদি নানা প্রতিভায় ধনী। তাঁর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, তিনি বাংলা 'শর্টহ্যাণ্ড' অর্থাৎ রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবক। বহুমুখী কুশলতা দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুর পরিবারে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুচর্চিত প্রতিভার মধ্যে কবিখ্যাতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। একদিকে নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য, সুমিষ্ট কবিত্ব, বিচিত্র ছন্দ-সৃষ্টি, অন্যদিকে কোমল-মধুর ভাষা এবং রুচিপূর্ণ হাস্যরস— ইত্যাদির সংমিশ্রণে তিনি কাব্য রচনা করে বঙ্গভারতীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাঁর কাব্যখ্যাতি প্রধানত 'স্বপ্নপ্রয়াণ'- এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে মেঘদূতের অনুবাদ, 'কাব্যমালা' (১৯২০); 'যৌতুক না কৌতুক' ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল হল তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থ। এটি আসলে রূপকধর্মী রচনা। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। অনেক সমালোচক এই কাব্যের সঙ্গে 'ডিভাইন কমেডি', 'ফেয়ারি কুইন', 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'সারদা মঙ্গল'-এর সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন; আসলে এ কাব্য অনন্য, বাংলা সাহিত্যের হাজার বৎসরের ইতিহাসে এর সমগোত্রীয় জুটি খোঁজা শক্ত। এই কাব্য সম্পর্কে সমালোচক বলেন "অঙ্গরূপের সঙ্গে রূপকের, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে উদ্ভট grotesque এর ঘনপিনদ্ধ ক্লাসিক রীতির সঙ্গে আলুলায়িত রোমাণ্টিক রীতির, বিশুদ্ধ কাব্যভাবনার সঙ্গে গদ্যাত্মক বাগ্‌-বিন্যাসের, তৎসম শব্দের সঙ্গে গ্রাম্যশব্দের, নায়কের সঙ্গে জোকারের এমন অর্ধনারীশ্বর মিলন আর কোন বাঙলা কাব্যে পাওয়া যাবে?" এ কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, এটি রচনার সময় তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল ছিলেন। তাই এতে অনেক পরিমাণে Metaphysics লক্ষ করা যায়।

'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে কিছু তত্ত্বকথা আছে, আবার হয়তো কিছু পরিমাণে আছে Metaphysics কিন্তু এ কাব্য দার্শনিকের কাব্য নয়। Ethics থাকলেও এতে Metaphysics এর বাহুল্য নেই। এ কাব্য আসলে বাল্য-রূপকথার কাব্য। যে শিশুর মন নির্বোধের মতো রূপকথার রাজ্যে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় এই কাব্যের মৃত্তিকা সেই শিশু গন্ধর্বলোকের স্বর্ণরেণুরঞ্জিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কাব্যকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। "স্বপ্নপ্রয়াণ" যেন একটি রূপকের অপরূপ রাজপ্রসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ-গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে।"

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ

এর রচয়িতা বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের এই শেষ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মাইকেল ফ্রান্সে, ভের্সাই সহরে থাকাকালীন রচনা করেন এবং ভারতে এসে তা মুদ্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেই সুদূর সাগরপারের দেশে ঘরছাড়া কবির চিত্তে অনেক স্মৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল এই কবিতাগুলোতে ধরা পড়ে। এই কবিতাবলির মধ্যেই কবির আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। মধুসূদনের এই সনেটগুলির মধ্যে ইতালীয় বা ইংরেজি সনেটের সব লক্ষণ না থাকলেও এর মূল্য

কম নয়। এই সনেটই নবীন বাংলা কবিতায় মাইকেলের সবচেয়ে সফল সৃষ্টি। বিশিষ্ট মধুসূদন-সমালোচক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ১০২ টি কবিতার বিষয়বিন্যাস করতে গিয়ে কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন—

(ক) ভারত তথা বাংলার কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা; পুরাতন কাব্যবস্তুর রসাস্বাদন,
(খ) জাতীয় সংস্কৃতির কথা,
(গ) ভাষা-ছন্দ-কাব্যরূপ ও রসপ্রসঙ্গ,
(ঘ) বিদেশী কবি পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন,
(ঙ) প্রেম,
(চ) নীতি ও ধর্মতত্ত্ব ও
(ছ) প্রকৃতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রধানত ইতালীয় কবি পেত্রার্কের (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এই অভিনব কাব্যরীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মাইকেল এমন বহু অভিনব সাহিত্যরীতি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি 'সনেটে'র প্রতিশব্দ হিসাবে চতুর্দশপদী কবিতা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার বিকল্প বাংলা সাহিত্যে আজও নেই। মাইকেলের সনেটে দেখা যায় চৌদ্দটি চরণ এবং প্রতি চরণে চৌদ্দটি মাত্রা বা অক্ষর। এর পর্বদুটিকে— ৮+৬ এভাবে ভাগ করা হয়। প্রথম আট পংক্তিকে বলা হয় 'অষ্টক' এবং দ্বিতীয় ৬ পংক্তিকে বলা হয় 'ষট্‌ক'। বাংলা পয়ারের আদল মেনেই মাইকেল বাংলা সনেটের কাব্যদেহ নির্মাণ করেন। চরনান্তিক মিল ও স্তবক গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন সেটা ইতালীর পদ্ধতি নয়, যদিও ১০২ টি কবিতার মধ্যে ৪৩ টিতে পেত্রার্ককে অনুসরণ করা হয়েছে (যেমন— কখ কখ কখ কখ + গঘ গঘ গঘ)। মাইকেল মিল্টনকেই বেশি অনুসরণ করেছেন। মিল্টনের অষ্টকে দুটি মিল, মধুসূদনেও তাই। মিল্টনের ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিল, মধুসূদনও তাই করেছেন। মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে পাঁচটির ষট্‌কে আছে তিনটি মিল, একটি অষ্টক-ষট্‌ক মিলে পাই তিনটি মিল আর বাকি ৯৬ টি কবিতার ষট্‌কে দুটি করে মিল আছে।

পদ্মিনী উপাখ্যান ঃ

উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলশ্রুতিতে নবজাগ্রত বাঙালি মনীষা শিল্প সাহিত্যে আপনাকে প্রসারিত করতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। যে কজন শিল্প ব্যক্তিত্বের হাত ধরা বাংলাকাব্য ভারতচন্দ্রীয় আদিরস এবং ঈশ্বর গুপ্তীয় কৌতুকরসের ক্ষুদ্র গণ্ডি ত্যাগ করে খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মুক্তি লাভ করল, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই পুরোধা-পুরুষ। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তাঁরই হস্তনির্মিত প্রথম কাব্য। এই কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

টডের Annals and Antiquities of Rajasthan এ আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং জহরব্রতে আগুন জ্বালিয়ে পদ্মিনীর আত্মাহুতি দানের বর্ণনাকে আশ্রয় করে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইংরেজি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের আদর্শে রাজপুত-দেশপ্রেমের ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশপ্রেম মিশ্রিত

ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের পত্তন করলেন রঙ্গলাল। তবে এ কাহিনির ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা সর্বাংশে প্রামাণ্য নয়।

'পদ্মিনী উপাখ্যানের' চরিত্র, কাহিনি, রচনারীতি কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষত বীররসাশ্রিত এই কাব্যে পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপ একাবলী ইত্যাদি গতানুগতিক ছন্দ ব্যবহারে দৃঢ়-পিনদ্ধ মহাকাব্যিক ফর্ম বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ফলে বাণীমূর্তি হয়নি প্রাণোচ্ছল। স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বীররসকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাব্যে মহাকাব্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বস্তুত তা হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য।

ভাষাগত দুর্বলতাও কাব্যটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন—

> "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়
> দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?
> কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়,
> দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।"

—এই ভাষাত পুনরুক্তিদোষ যতই থাক; ভাবের মধ্যে যে বীররস, রৌদ্ররস ও করুণরসের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে শুধু তার জন্যই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ক্ষত্রিয়দের প্রতি রানা ভীমসিংহের এই উৎসাহবাণী পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ভারতবাসীর মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার কাজে অনুপ্রেরণা দান করেছিল।

পরিশেষে বলা চলে অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা না পেলেও সিপাহি বিদ্রোহের এক বছরের মধ্যেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের মাধ্যমে পরাধীন জাতির জীবনে স্বাধীনতার আর্তি সঞ্চার করার সচেতন দায়িত্ব নিয়েছিলেন রঙ্গলাল; আর এই উপযোগিতার জন্যই সাহিত্যের ইতিহাসে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিশেষ উল্লেখের দাবিদার এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে।

'কুহু ও কেকা' / সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ

'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এই কবির জীবনকাল ১৮৮২ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটু রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথম কবিতা 'দুই সুর' থেকেই এ ব্যাপারে ধারণা হয়। কুহু হচ্ছে রঙের, সুরের, রসাবেশের রূপক, আর কেকা হচ্ছে রূপের, গন্ধের, সুখ-উল্লাসের প্রতীক। এই রূপক দুটি দিকে প্রযোজ্য —বনে ও মনে। শুধু কাব্যনামে নয়, এই কাব্যের বেশিরভাগ কবিতায় দেখা যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ রঙ ছেড়ে সুরের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং তাঁর কাব্যচিন্তা ধ্বনির পথ ধরে রূপের অভিসারে অগ্রসর হয়েছে। ধ্বনি ও রূপের সহযোগিতা কয়েকটি কবিতাকে অসাধারণ চিত্র সৌন্দর্য দান করেছে— এটাই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের চরম পরিণতি। প্রেম তাঁর কাব্যে দুর্লভ বিষয়। কিন্তু 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় সেই আদিম হৃদয়াবেগের আভাস পাওয়া যায়। ব্যতিক্রমী বিষয় হলেও পাঠক তা গ্রহণ করেছিল। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় বাংলাদেশে স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবাদ ও দেশপূজায় আত্মবলিদানের নেশায় মত্ত। এই ভাবনাকেও কবি উক্ত গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের 'সৎকারান্তে' এবং ছিন্নমুকুল' কবিতায় কবি নিজের মনের গোপন কথা বলেছেন; যা এই কবির কবিতায় প্রায়ই দুর্লভ। এই গ্রন্থেই কবির ছন্দ সম্পর্কিত দীর্ঘ সাধনা সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

'কুহু ও কেকা' ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যভাণ্ডার বেশ ধনী। তাঁর কিছু কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়— 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬); 'হোমশিখা' (১৯০৭); 'ফুলের ফসল' (১৯১১); 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬); 'তুলির লিখন' (১৯১৪); 'বেলাশেষের গান' (১৯১৭) ইত্যাদি। তিনি কিছু কাব্যগ্রন্থ অনুবাদও করেছেন— 'তীর্থসলিল' (১৯১০); 'তীর্থরেণু' (১৯১৪), মণি-মঞ্জুষা' (১৯১৫) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তথা সমসাময়িক অনুজ বহু কবিদের আদর্শ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তবু সমালোচক এই কবি সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা করেন না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে আলোচনা সাঙ্গ করা যাক— "কবিকল্পনার যে দুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজীতে যাহাদিগকে Fancy ও Imagination বলে ও যাহাদিগকে কল্পনা-বিলাস ও কল্পনা-নিষ্ঠা এই দুই বাঙলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে Fancy বা কল্পনার লঘু লীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।...সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্চতর কল্পনানিষ্ঠার [Imagination] খুব বেশি সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না।...."

অগ্নিবীণা ঃ

এটি কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৮-১৯৭৬) প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। সেদিনের বাঙালি পাঠক রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাওয়া সত্ত্বেও নজরুলের মতো এমন একজন নতুন প্রতিভাকে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা বিস্ময়কর। কোনো রকম প্রচার ছাড়াই এই বইটি বিষয় বস্তুর গুণে এমন সার্থক হয়েছিল তা কল্পনাতীত।

কবি নজরুল ইসলাম এই কাব্যগ্রন্থের নাম— 'অগ্নিবীণা' রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের একটি চরণের অনুপ্রেরণায়, গানটি হল— 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'। এই গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা বারোটি। এই গ্রন্থ তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গে একটি কবিতাও রয়েছে।

কাজি নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যজগতে যে সময় আবির্ভূত হন, রাজনৈতিক দিক থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অবসান হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষেও মানসিক অবসাদ চেপে বসেছে। ইংরেজের শাসন ভারতবাসীর উপর আরও গভীর হয়েছে। ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির অহিংসাও অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরের বৎসর তার সূত্রপাত হয়, ভুল নেতৃত্বের ফলে অহিংসা সহিংসায় রূপান্তরিত হয়, ফলে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। অথচ জাতীয় জীবনে যে উন্মাদনা জেগেছিল তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না, দেশ জুড়ে নানাভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। এই ঘটনাকে সামনে রেখেই 'অগ্নিবীণা' রচিত হয়।

'অগ্নিবীণা'র রচনাকাল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ। ফলে বইটি প্রকাশমাত্রই জনসমাদর লাভ করল।

'অগ্নিবীণা' প্রকাশের পর নজরুল আপোসহীন সংগ্রামে ব্রত যুবকদের আদর্শ কবিরূপে চিহ্নিত হলেন। ক্রমে তিনি সমগ্র বাংলার চারণকবি হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি বাংলার নগরে-গ্রামে-পল্লিতে ভ্রমণ করে দেশবাসীকে ভৈরবকণ্ঠে স্বজাতীয়ত্বে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। এবার আমরা 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে এই আলোচনার ইতি টানব— "সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো/জ্বলে যেথা জ্বলে কাল চিতা/তোমার খড়্গ রক্ত হউক/স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা/টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা/গল্-হার হোল নীল ফাঁসী/নয়নে তোমার 'ধূমকেতু'-জ্বালা/উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।।" (রক্তাম্বর-ধারিণী মা)।

১.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করলে আমরা দেখব যে ঈশ্বর গুপ্ত যুগসন্ধির কবি। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ও সংঘাত ধরা পড়েছে। তিনি অনেকাংশে স্ববিরোধাক্রান্ত, ব্যঙ্গরসের উদ্বোধনেই তাঁর সর্বাধিক সার্থকতা।

আখ্যানকাব্যে ইতিহাসের কাহিনি বর্ণনার মধ্যে আধুনিক জীবনোচিত দেশপ্রেম সঞ্চারিত হল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনলেও ফর্মের ক্ষেত্রে গতানুগতিক। মধুসূদনের বহুবিস্তারী প্রতিভাস্পর্শেই বাংলা কাব্যে যথার্থ আধুনিকতা সূচিত হল। একমাত্র মধুসূদনই মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও রসবৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বিহারীলালের হাতে বাংলা গীতিকাব্যের মুক্তি সূচিত হল, তিনিই বাংলা গীতিকাব্যকাননের ভোরের পাখি। বহু খ্যাত-অখ্যাত কবি তাঁর অনুসরণ করছেন, তবে বাংলা গীতিকবিতাকে বিশ্ববরেণ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর হাতেই বাংলা কবিতার যথার্থ ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। অবশ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধে একদল কবি রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

১.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

সিপাহি বিদ্রোহ : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। বন্দুকের টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি দুইই মিশ্রিত আছে— এই জনরবের ফলে এই বিদ্রোহ শুরু হয়, কারণ এই উভয় দ্রব্য হিন্দু ও মুসলমানের জাতিনাশক। মঙ্গল পাণ্ডে, তাঁতিয়া টোপি, নানা সাহেব প্রমুখ এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা।

কুমারসম্ভব : কবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। এতে হর-পার্বতীর মিলনের কাহিনি বর্ণিতহয়েছে। কাব্যটি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটির সাতটি খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

ট্র্যাজেডি	ঃ	বিয়োগান্তক কাব্য।
হোমার	ঃ	গ্রিস দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইলিয়াড ও অডিসি কাব্য দুটির জন্য তিনি সাহিত্যজগতে অমরতা অর্জন করেছেন।
ভার্জিল	ঃ	বিখ্যাত রোমীয় কবি। প্রসিদ্ধ ইনিডি কাব্যটি তাঁরই রচনা। তাঁর অন্য দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল Georgics এবং Ecloges।
দান্তে	ঃ	ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর La Devina Commedia গ্রন্থটি পৃথিবী বিখ্যাত।
মিল্টন	ঃ	প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিচারে কিছুদিন কারাভোগ করেন। কারামুক্ত হওয়ার পর তিনি প্যারাডাইজ লস্ট প্যারাডাইজ রিগেণ্ড এবং স্যাম্‌সন্‌ অ্যাগোনিস্টেস নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ Areopagitica বিশেষ প্রসিদ্ধ।
ড্রাইডেন	ঃ	ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ১৬৭০ থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজকবি ও রাজকীয় ইতিহাস লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গনাটক রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। All for Love, Rehearsal ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
শেলি	ঃ	উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। The Necessity of Atheism নামক গ্রন্থ রচনা করায় কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেছিলেন। ইতালিতে ভ্রমণ করার সময় Prometheus Unbound নামে বিখ্যাত গীতিকাব্য রচনা করেন। তাঁর অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে Ode to the West Wind, To a Skylark, The Cloud ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
কিটস	ঃ	বিখ্যাত ইংরেজ কবি। কবি শেলির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। Isabella, Endymion ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁকে সৌন্দর্যের কবি বলা হয়।
ওয়ার্ডসওয়ার্থ	ঃ	বিখ্যাত ইংরেজ কবি। কবি কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ উভয়ে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Lyrical Ballads নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে Duty, Excursion ইত্যাদি প্রধান।
সুইনবার্ন	ঃ	খ্যাতনামা ইংরেজ কবি। তিনি স্বাধীন চিন্তাশীল কবিদের অগ্রণী। তাঁর রচনার মধ্যে গীতিকবিতাগুলিই উৎকৃষ্ট। Songs before Sunrise, Bothwell ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাংলা কাব্য কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব আলোচনা করুন।

২। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাভঙ্গি প্রাচীনপন্থী হলেও তিনি নানা আধুনিক ভাবের বিকাশের সূত্রপাত করেছেন। তাঁর কবিতাবলিতে এই আধুনিক ভাবের দিকগুলি দেখিয়ে পরবর্তী বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাব নির্দেশ করুন।

৩। কাব্য সাধনায় ও কবিতার অঙ্গসজ্জায় কবি মধুসূদন সাহিত্যের ইতিহাসে বলিষ্ট আদর্শের ছাপ রেখে গিয়েছেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করে মধুসূদনের কৃতিত্ব এবং তাঁর ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি আলোচনা করুন।

৪। বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় মহিলা কবি গোষ্ঠীর রচনা নৈপূণ্য বিশ্লেষণ করুন এবং প্রসঙ্গত বাংলা সাহিত্যে তাঁদের আর্বিভাবের কারণ নির্ণয় করুন।

৫। ঊনবিংশ শতকের বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য দেখান এবং উভয় রীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরুন।

৬। মধু-হেম-নবীনের খণ্ডকাব্যে যেমন মহাকাব্য সুলভ ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল তেমনি ছোটো কবিতায় ছিল ঐতিহ্য, দেশ ও প্রকৃতিচেতনার সুর। আলোচনা করুন।

৭। বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিদ্রোহ মূলত অন্ধতা, অন্যায় ও পঙ্গু মানসিকতার বিরুদ্ধে মানবীয় চেতনায় সমুজ্জ্বল। আলোচনা করুন।

৮। রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯। বাংলা কবিতার যে যুগান্তকারী পালাবদল বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সাধিত হয়েছিল তার স্বরূপ কেমন সে সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করুন।

১০। কবি এবং সাংবাদিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা বিচার করে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১১। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আধুনিক বাংলা কবিতায় যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল তার সবিশেষ পরিচয় দিন।

১২। রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

১৩। 'ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার জোয়ার এসেছিল বটে, প্রকৃত মহাকাব্য বলতে কেবল একটি দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।' এ কথার অর্থ সবিশেষ লিখুন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'মহাকাব্য রচনার জোয়ার' বলতে কি নির্দেশ করা হয়েছে বোঝান।

১৪। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য কীরূপে নতুন ভাব ও ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিন।

১৫। টীকা লিখুন ঃ

চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কুহু ও কেকা, উদভ্রান্ত প্রেম, অগ্নিবীণা, কর্মকথা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী, নজরুল ইসলাম, ভানুসিংহ, স্বপ্নপ্রয়াণ, পদ্মিনী উপাখ্যান, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এষা, জীবনানন্দ দাশ।

১.৯ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ৪ দ্রষ্টব্য।

●●●

দ্বিতীয় বিভাগ

বাংলা কবিতার ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
২.২ কবিতায় রবীন্দ্র-বিরোধ
২.৩ জীবনানন্দ দাশ
২.৪ বিষ্ণু দে
২.৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
২.৬ অমিয় চক্রবর্তী
২.৭ সমর সেন
২.৮ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
২.৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের বাংলা কবিতা
২.৯.১ পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতা
২.৯.২ ষাটের দশকের বাংলা কবিতা
২.১০ সংক্ষিপ্ত টীকা
২.১১ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
২.১২ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
২.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
২.১৪ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

যুগে যুগে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পালাবদলও সূচিত হয়। একই কারণে বাংলা সাহিত্যের পালাবদলও সূচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি সভ্যতা সংস্কৃতির সান্নিধ্য-প্রেরণায় বাঙালির মনন ও বাংলা সাহিত্যে যে পালা বদলের ঘন্টা বেজেছিল, তারই ফলে আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতা, মহাকাব্য ইত্যাদি উদ্ভব হয়। মধুসূদন মহাকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি এবং রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার একাধিপত্য সম্রাট হয়ে প্রায় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিরাজমান ছিলেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের জীবিৎকালেই বাংলা সাহিত্যের আবার পালাবদলের তৎপরতা দেখা গেল। একদল নবীন সাহিত্যিক সমকালীন যুগযন্ত্রনা, বিভিন্ন মতবাদ, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত ও প্রত্যক্ষভূত হয়ে সাহিত্যের ভাব ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের একাধিপত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে তাঁরা বাংলা

কবিতার জগতেও নতুন ভাব ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সচেষ্ট হলেন। আসুন, এবার রবীন্দ্র পরবর্তী সেই সব আধুনিক কবিদের ভাব-বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ইংরাজি সভ্যতার স্পর্শ সান্নিধ্যে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হ'ল, বাংলা সাহিত্য নানা ধারায় প্রবাহিত হ'ল, কাব্য ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা গেল। সাহিত্যিক মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যে রচনায় কৃতিত্ব দেখানে মধুসূদন এবং বাংলা গীতিকবিতা উৎকর্ষ লাভ করল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ভাব ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হ'ল। কবিতার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কবিতার ভাব-বিষয়বস্তু-রচনারীতি ছন্দ সমস্ত দিক থেকেই এক পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। কবিতায় দেখা গেল রবীন্দ্র বিরোধীতা। এযুগের কবি-সাহিতিকেরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সর্বাঙ্গক্রমে যে তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এই অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্র পরবর্তী জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের বাংলা কবিতার ধারা নিয়ে আলোচনা করব।

২.২ কবিতায় রবীন্দ্র-বিরোধ

একদল নবীন সাহিত্যিক কল্পনার জগত ছেড়ে সমাজের দরিদ্র কুৎসিত অবজ্ঞাত ও ছায়াচ্ছন্ন বসতির দিকে নজর ফেরালেন। 'ভারতী'-র আসরে প্রথম এই বাস্তব-বিলাসিতার উন্মোচন আর এর লালন-পালন কিছুটা 'নারায়ণ'-এর পৃষ্ঠায়। মূলত বিদেশি উপন্যাস আর দেশীয় নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতি তরুণ লেখকদের মধ্যে এই বিলাসের ঢেউ তোলে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ঢাকায় গিয়ে ধীরে ধীরে সে সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁরা সাহিত্যকর্মে এই 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে। 'ভারতী'-র আসর ভেঙে গেলে সেই আসরের কয়েকজন লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় জন্ম দেন 'কল্লোল' পত্রিকার (১৯২৩), যার বীজ বপন হয়েছিল ঢাকার 'বাসন্তিকা' পত্রিকার (১৯২২) মধ্যে। কিছুদিন পর ঢাকায় 'কল্লোল'-এর একটি শাখা বের হয়— 'প্রগতি' (১৯২৭), যার পূর্বেই কলকাতায় প্রকাশ হয়েছিল 'কালি-কলম' (১৯২৬)। এই কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অনুগামীরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে জাত ও পুষ্ট হলেও রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্যক উপলব্ধি তাঁদের হয়নি, আধুনিক বিদেশি সাহিত্যেই এঁরা অভিভূত ছিলেন। এঁরা এঁদের প্রবল বাধা বলে মনে করলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্র-রচনায় মুগ্ধ বাঙালি-পাঠককে। এঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র সেকেলে, রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মিক। শরৎ-প্রীতি ছিল আন্তরিক। ক্রমে এই সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর বাজার-দর বাড়াতে সাহায্য করে 'শনিবারের চিঠি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩১)। এই পত্রিকা ঐ লেখক গোষ্ঠীর রচনার টুকরো প্রতিমাসে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিবেশন করার দায়িত্ব নেয়।

এরপর রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নামেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন

মোহিতলাল মজুমদার ও 'তরুণ' আধুনিক সাহিত্যিকরা, এঁরা প্রবলভাবে ঘোষণা করেন রবীন্দ্রনাথের যুগ অতীত হয়েছে, এসেছে 'অতি আধুনিক' যুগ। এই যুগের নেতা গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় নজরুল ইসলাম। সাহিত্যে এই 'অতি আধুনিকতা'র নামে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল তা রবীন্দ্রনাথকেও অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। কিন্তু 'অতি আধুনিক'দের রবীন্দ্র-বিরোধিতা যেন ছিল স্বতঃসিদ্ধ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' (১৩৩৫) প্রকাশ হলে এঁরা বুঝলেন যে-টেকনিক 'অতি-আধুনিক'দের কাম্য অথচ নাগালের বাইরে তা কেমন অনায়াসে নতুন রূপের সৃষ্টি করেছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেউলিয়া ঘোষণা করে নিজেদের সাহিত্যের নতুন কারবারি বানাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা দেখলেন রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদে নূতনতর শিল্প সৃজন করে চলেছেন। 'শেষের কবিতা'-তেই থামলেন না কবি, সেই ভাবই কঠিনভাবে ব্যক্ত করলেন 'বাঁশরী'-তে (১৯৩৩)। এরপর আমদানি করলেন গদ্য-কবিতা। যা দেখে নবীন কবিরা বিস্মিত হলেন। অতঃপর তাঁদের রবীন্দ্র-বিরোধিতা ধীরে ধীরে অস্তমিত হল— মনে মনে না হোক অন্তত মুখে। ক্রমে এঁদের সাহিত্যচর্চা অন্যদিকে মোড় নিল।

২.৩ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি। বেশ খানিকটা বিলম্বেই বাংলা কাব্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো— ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা এবং বেলা অবেলা কালবেলা। আধুনিক বাংলা কাব্য যাঁদের স্পর্শে যথার্থ ব্যক্তিস্বারূপ্য লাভ করেছিল জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম।

তাঁর বাক্‌রীতি হপকিন্‌সের মতো গভীরভাবে ব্যঞ্জনাধর্মী। তাঁর বস্তু-প্রতীক এবং প্রতীকী অর্থব্যঞ্জনার মধ্যে সব সময় সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সমস্ত সত্তা দিয়ে, সমগ্র চেতনা দিয়ে বিশ্ববোধ ও ব্যক্তিবোধের সমন্বয় খুঁজেছেন, কখনও আত্মার গভীরে ডুব দিয়েছেন, কখনও দূর দেশকালের স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যে পথ চলেছেন। কখনও তিনি রূপদক্ষের মতো বিশ্বের রূপমাধুরীকে বিচিত্র প্রতীক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন, কখনও ধ্বনিব্যঞ্জনার মাধ্যমে পৌঁছে গেছেন বাক্যমনের অগোচর এক জগতে। তাঁর কবিতায় জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি একই সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণা এবং অবহেলা সমানভাবে ক্রিয়াশীল, প্রবল নৈরাশ্য, প্রেমিকা-নায়িকা বনলতা সেন বা শঙ্খমালা বা সুচেতনার মধ্যে নিজের মৃত্যুরূপ নিয়তির অনুভব জীবনানন্দকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য এবং অসাধারণত্ব। তিনি অজস্র রঙের কবি; সব ইন্দ্রিয় উপভোগের— একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় বিপর্যয়েরও কবি। উত্তরহীন সমস্যা, সমাধানহীন বর্তমান তাঁকে পীড়িত করেছে বারবার।

২.৪ বিষ্ণু দে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক এক বড় অংশের বাংলা কবিতার কবিরা যে আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেই পথের

অন্যতম যাত্রী বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। জীবনানন্দের কবিতায় জীবনের জটিল পথে মনের গোপন গতির যে যন্ত্রণা প্রকাশিত, তাই অনেক কৌশলী ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেল বিষ্ণু দে-র কবিতায়।

তাঁর কাব্যরচনার কাল ১৯২৮-৭৭। 'উর্বশী-ও আর্টেমিস' থেকে শুরু করে 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। আধুনিক ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়ট তাঁকে যথার্থ প্রভাবিত করেছিলেন, তাই এলিয়টের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির তীব্রতা ব্যক্তিত্বের সংসর্গ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ কবিতার জন্ম সম্ভব নয়। তবে বিষ্ণু দে-র কবিতা কখনও নিঃসঙ্গতাজনিত নেতি-অবক্ষয়ে সমাপ্ত হয়নি। তার বদলে তাঁর কবিতায় এসেছে দেশজ শিকড়ের আত্মানুসন্ধান, রবীন্দ্র-উৎসের দিকে ফিরে তাকানো, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কিত সচেতনতা। এমনকি লেনিন-প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় বার বার এসেছে চল্লিশ থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত। শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের প্রতি, সাঁওতালদের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা সঞ্চারিত হয়েছিল। নাগরিক কবি হয়েও বারবার তিনি গ্রামের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তাঁর কাব্যে বিদেশি কাব্যের অনুষঙ্গে দেশজ যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। ওফেলিয়া ক্রেসিডা ট্রয়লাস বা লিয়রের প্রতীকে দেশজ যুগলক্ষণ ও সংকটই প্রতিভাসিত। তাঁর কাব্যে প্রেম প্রথাসিদ্ধ উপাদান মাত্র নয়, তার প্রত্যাশা দীপ্ত বিশ্ববিজয়ীর মতো। তিনি পরিবেশপীড়িত হলেও সমাজসচেতন— তাই ব্যক্তিকতার গন্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তাঁর কাছে স্বপ্নের চেয়ে সংগ্রাম বড় কারণ তা বাস্তবভিত্তিক, আর তাই তা জীবনভিত্তিক।

বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থের তালিকা—

প্রথম বই— 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২)

দ্বিতীয় বই— 'চোরাবালি' (১৯৩৮)

তৃতীয় বই— 'পূর্বলেখ' (১৯৪১)

চতুর্থ বই— 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭)

পঞ্চম বই— 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০)

ষষ্ঠ বই— 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) ইত্যাদি।

জাতীয় জীবনের বিকাশের সঙ্গে তাল না রেখে, অপ্রকৃতিস্থভাবে, কলোনির অর্থনৈতিক শোষণের প্রয়োজনে যে-শহর গড়ে উঠেছিল গ্রামজীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে— সেই নির্মম পাথুরে প্রাণহীন শহরই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'-র পটভূমি। 'সন্দীপের চর'-এই তিনি ব্যক্তিকতার নিগড় অতিক্রম করে 'অন্বিষ্ট'-এ উপনীত হন, সেখানে তাঁর কামনা শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুখী সচ্ছল জীবনের পত্তন। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ কবি হতাশা ও বিষাদের তীব্রতায় দীর্ণ হন, 'এ নরকে/মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই/সেখানেই রয়েছি আজ সে কোন গ্রাম নয়, শহরও তো নয়।' তবুও কবির সত্তা বিস্মৃত হয় না। তাই জনমানসের জন্য তাঁর আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হয় এখানেই। 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থে কবি পেতে চান স্তব্ধ শান্ত পৃথিবীতে মুক্ত মানুষের

উপস্থিতি। 'উত্তরে থাকো মৌন' কাব্যগ্রন্থ কবির দৈনন্দিনতার দেশকালের পরিচয়ের সঙ্গে পৃথিবীর সময় ইতিহাসও লগ্ন হয়ে থাকে। এভাবেই চার দশকের বেশি সময় ধরে যে নিরবচ্ছিন্ন সততা, আদর্শপরায়ণতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি কবিতা লিখে গেছেন সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদও পেতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কেবল স্মৃতি নন, উপলক্ষ নন, ছবি নন বা পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ নন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে প্রেরণাস্থলও।

২.৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এলিয়টের সঙ্গে সাদৃশ্য যেমন বিষ্ণু দে-র কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য, তেমনি ম্যালার্মে ও তাঁর অনুগামী প্রুস্ত-কে মনে করা হয় 'পরিচয়ে'-র সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র (১৯০১-১৯৬১) কবিতার আদর্শ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' প্রকাশিত হয় ১৯৩০-এ। 'পরিচয়' (১৯৩১) বের করার পর সুধীন্দ্রনাথ নতুন ধরনের কবিতা লেখায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ— 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩) ও 'দশমী' (১৯৫৬)।

'সংবর্ত'-র ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'ম্যালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।' তবে ম্যালার্মে তাঁকে প্রভাবিত করলেও তাঁর কাব্যে প্রুস্তের নীতিরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়— আত্মার আমল অস্তিত্ব অস্বীকার, বুদ্ধির উপর আস্থাহীনতা, প্রেমের অবাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রবলভাবে স্বীকার।

বস্তুত একজন মহৎ কবির মতো ইতিহাসচেতনা তাঁর কাব্যেও বর্তমান, তবে শেষপর্যন্ত তা তাঁর কাব্যে নিয়তিবাদের রূপ নিয়েছে। তবে এই নিয়তিবাদ হিন্দুশাস্ত্রের কর্মফলবাদ নয়, এ ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে নির্বিকার ও উদাসীন।

সুধীন্দ্রনাথের রচনাকৌশলেও প্রুস্তের নীতি অনুসৃত। প্রুস্তের মতে, শব্দের প্রকৃতি সুরের মতো, সুরের পরম্পরায় যেমন সঙ্গীত রচিত হয় শব্দের পরম্পরায় তেমনি অর্থ ও ব্যঞ্জনা গড়ে ওঠে। তবে নূতন ব্যঞ্জনার জন্য নূতন শব্দসৃষ্টি সর্বদা আবশ্যক নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়, পুরনো অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেও সেই কাজ চলে। এই সূত্র মেনে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কখনও কখনও এবং গদ্য সর্বদা অপ্রচলিত কঠিন আভিধানিক শব্দে আকীর্ণ।

'ক্রন্দসী'-তে যেখানে সুধীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ব্যর্থতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে 'উত্তরফাল্গুনী'-তে কবিচিত্তে প্রেম ও আশা জেগেছে। এই পরিবর্তন এসেছে ঈশ্বর-বিশ্বাসে নয়, কালের বিনাশের প্রতি দৃঢ় আস্থায়। 'দশমী'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৪-৫৬। কবিতার নামগুলি তাৎপর্যপূর্ণ— 'প্রতীক্ষা', 'নৌকাডুবি', 'ভ্রষ্টতরী', 'নষ্ট নীড়' প্রভৃতি। এখানে কবি নিজেকে ক্ষণভঙ্গবাদী বলেছেন, অর্থাৎ, তিনি কালের বৈনাশিকত্বে বিশ্বাসী।

সুধীন্দ্রনাথ এজরা পাউণ্ডের অনুকরণে আধুনিক নতুন কৃত্রিম শব্দ তৈরি করতেন। কিছু নিদর্শন— অতিপ্রজ, অপ্রতিকার্য, অনুত্তার্য ইত্যাদি। ধ্রুপদী ভাষার প্রতি আস্থা,

নাটকীয় স্বগত ভাষণের ভঙ্গিতে উচ্চারণ সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর কাব্যে শত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও এক রোমান্টিকতার স্বাদ এনে সৌন্দর্য দান করেছে।

২.৬ অমিয় চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঠিক বিপরীত পথে গভীর আশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণে আধুনিকতা ঘোষণা করলেন অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)। সুধীন্দ্রনাথের মতো ইনিও সমাজ এবং সংসারের ভাঙন নিয়ে ভাবিত, কিন্তু ইনি চরম আস্তিক্যবাদী। তাই ঠিক যখন সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন 'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া' তখনই অমিয় চক্রবর্তী 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' এই আশ্বাসে সুস্থির। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বিস্তৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর কবিতার বিষয়ও বিচিত্র। সাময়িক ইতিহাসকে যেমন কোথাও অস্বীকার করেননি, তেমনি কোনও রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক বিশ্বাসের দ্বারাও পরিচালিত হননি, জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও বাংলাদেশের শিকড়ের সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত থাকাই তাঁর কাব্যগ্রন্থ— 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'পারাপার' (১৯৫৩) এবং 'পালা-বদল' (১৯৫৫)-কে অনন্যতা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়েও আঙ্গিকের দিক থেকে এই কবি অনেক বেশি স্বতন্ত্র। শব্দচয়নে, প্রচলিত শব্দের অন্যরকম ব্যবহারে, উচ্চারণের ভঙ্গিতে তিনি নির্জস্বতা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কবিতায় জীবনের চলমান ছবি ধরা পড়েছে।

২.৭ সমর সেন

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' (প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪১) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করেছিলেন সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই 'কবিতা' পত্রিকায় নাম করেছিল। চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় এক বিতর্কিত নাম হিসেবেই চিহ্নিত হন তিনি। একদম ভিন্ন সুরের গাঢ়-সংহত গদ্যকবিতা প্রকাশ করে অনন্য হন তিনি। সেখানে নগরজীবনের নোংরামি ও ক্লান্তির পাশাপাশি সাঁওতাল পরগনার শাও মাধুর্যও স্থান পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের মতো সমর সেন-এর কবিতাতেও মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা রয়েছে এবং তা অনেক বেশি তীব্র। তাঁর কবিতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে ধরা পড়ে তাঁর মার্কসবাদের প্রতি আস্থা।

সমর সেন-এর কবিতার সংখ্যা যেমন পরিমিত, তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিও নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়। কাব্যগ্রন্থ— 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২) ও 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)। তিনি তাঁর সময়ের একমাত্র কবি যিনি সাহিত্য সম্বন্ধে গদ্যে পদচারণা করেননি।

২.৮ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সাম্যবাদের স্পর্শ বাংলা কবিতায় পড়েছিল নজরুলের 'অগ্নিবীণা' থেকেই, কিন্তু সাম্যবাদের সুর সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্বে স্থায়িভাবে উপস্থিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) 'পদাতিক' (১৯৪০) থেকে। তিনিই বাংলা কবিতার প্রথম কবি যিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। 'সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।' (কালের পুতুল/বুদ্ধদেব বসু) তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হ'ল— 'চিরকুট' (১৯৪৬), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৮), 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), কালমধুমাস' (১৯৬৬) প্রভৃতি। তিনিই বোধহয় প্রথম কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন শুরু করেননি, এমনকি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না। 'পদাতিক'-এ নিপীড়িত মানুষের মুক্তি প্রার্থনাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়। কবি-জীবনের প্রথম থেকেই তিনি নিজেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বিচ্ছিন্নতার দর্শন থেকে মুক্ত করার জন্য বৈপ্লবিক কাজকর্মে নিযুক্ত। 'পদাতিক'-এর প্রথম কবিতা 'মে দিনের কবিতা'-তেই ছিল সেই ঘোষণা— 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'। জীবনকে তিনি ভালোবাসেন বলেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের নিগড় থেকে মুক্তি কামনাই তাঁর অন্যতম কাব্যিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাছে রাজনীতি এসেছে জীবনের তাগিদে, কবিতায় মার্কসীয় দর্শনের উপস্থিতিও জীবনকে মেনে নিয়েই। প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন— 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। সুভাষের কবিতায় প্রেম আছে, তবে তা জীবনের থেকে বড় নয়— 'প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি/অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো।' রাজনীতি আর কবিতার মহাবস্থানে তাঁর কবিতা জীবনমুখী, মানবমুখী। তাঁর কবিতার ভাষা নবীন শক্তিতে রূপায়িত, সাংকেতিকতার ব্যবহার তাঁর কবিতায় অনেক প্রদীপ্ত। তাঁর কবিতা তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতারই ফসল, তাই তা নদীর মতোই বহমান।

২.৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের বাংলা কবিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে উত্থান-পতন চলে তার থেকে ভারতবর্ষও বাদ পড়ে না। বিশেষ করে সাম্যবাদীদের কাছে এ যুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। একইসঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধও বিশেষ অবস্থান নেয় এই সময়। অরুণ-মিত্র, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পর বাংলা কবিতা যেভাবে তার যাত্রা অবিচ্ছিন্ন রাখল সেই জয়যাত্রা ফিরে দেখব এই অংশে, আলোচনার সুবিধার্থে আমরা 'দশক' হিসেবে বিষয়টিকে বিভক্ত করলাম।

২.৯.১ পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতা

এই দশকের এক উল্লেখযোগ্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন চল্লিশের দশকেই। সেই উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিতেও নম্র, রোমান্টিক কবিকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। পরবর্তী দশকে তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে সমাজ

এবং সমকালীন দেশ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'নীলনির্জন', 'নীরক্তকরবী', 'উলঙ্গ রাজা', 'কলকাতার যীশু' প্রভৃতি।

এই সময়েরই সমাজ সচেতন আর এক উল্লেখযোগ্য কবি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী অকালপ্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। যিনি খুব অল্প বয়সেই বিষয়— ভাষা-ছন্দ সবকিছুর নৈপুণ্যে পাঠকের কাছে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই' প্রভৃতির মাধ্যমে।

এই দশকের যে দুজন কবির রোমাণ্টিকতা, উদ্দামতা, নতুন ভাবে কথা বলার স্পর্ধা পাঠকের মনোহরণ করেছিল তাঁরা হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় আবির্ভূত হয়ে পাঠককুলকে চমকে দিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-৯৫)। নারীর প্রতি প্রেম বা প্রেমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতার মূল বিষয় হলেও মানুষের জন্য অসম্ভব এক মমতা এবং অনুরাগ মিশ্রিত আবেগও উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাঁর কাব্যসাধনার সূচনা 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬০) দিয়ে। এরপর ক্রমে আসবে 'ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো' (১৯৬৫), 'সোনার মাছি খুন করেছি' (১৯৬৭), 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' (১৯৭১), 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' (১৯৭২), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' (১৯৮২) ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর বিভিন্ন কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে যন্ত্রণাহত মানুষের ডাক শোনার জন্য কান পেতে রাখা— আধুনিক কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনদর্শনের মাত্রা যোগ করে। তাঁর কবিতায় জীবনপিপাসা ও মৃত্যুভাবনা 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম।' কিন্তু মৃত্যু ভাবনা থাকলেও তার জন্য জীবন বিবর্ণ, ধূসর হয়ে যায় না, পঞ্চাশের প্রায় সব কবির মতোই শক্তিও সুন্দরের উপাসক। তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক। নিবিড় ইন্দ্রিয় মুগ্ধতায় প্রকৃতিকে দেখেন তিনি। তাঁর কবিতায় আছে এক ধরনের দুর্বোধ্যতা ও অকারণ রহস্যময়তা। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার এক বর্ণময় কবি।

অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আদ্যন্ত রোমাণ্টিক কবি। তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়-ই নারী এবং প্রেম। তাঁর কাব্যের 'নীরা' এক রহস্যময়ী চিরপ্রেমিকা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'আমি কিরকমভাবে বেঁচে আছি', 'বন্দী জেগে আছো', 'আমার স্বপ্ন, দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি অস্বীকার করে একদম নিজস্ব ভঙ্গিতে রোমাণ্টিসিজমকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি বাংলা সাহিত্যে।

এঁদের পর পঞ্চাশের দশকে আরও দুই কবি-বন্ধুর কবিতা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তাঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভাষা এবং বিষয় উপস্থাপনের ভঙ্গিতে দুজনেই বাংলা আধুনিক কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। শঙ্খ ঘোষের মানববোধ অত্যন্ত বিস্তৃত ও রবীন্দ্র-ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁর কবিতায় শব্দগত চটুলতা নেই, হালকা চাল নেই, আছে সহজ গভীর এক বোধ। কবিতা তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের বহিঃ প্রকাশ নয়, মহৎ চেতনায় প্রবেশের চাবিকাঠি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬)। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ— 'নিহিত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'আদিম লতাগুল্মময়' (১৯৭২), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪) 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' (১৯৮৭) ইত্যাদি। শঙ্খ ঘোষের কাব্যের প্রধান গুণ— মিতভাষিতা ও সংহতি। আপাতত সরল সাদামাঠা পংক্তির আড়ালে চাপা

আবেগ, নিষ্ঠুরতা, প্রেমের তীব্র সঞ্চার ধরা পড়ে সতর্ক পাঠকের কাছে। তাঁর কবিতা আত্মানুসন্ধানের কবিতা। কেবল ব্যক্তিগত আত্মানুসন্ধান নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সমকাল ও মানবসমাজের শিকড়ের অনুসন্ধানও।

অলোকরঞ্জনও প্রত্যয়ী, শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহারে, বাংলা ভাষার নতুন নির্মাণে, বুদ্ধির উজ্জ্বল প্রকাশে তিনি সরব উপস্থিত থাকেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় জীবন-জটিলতার ছায়া যেমন আছে, তেমনি আছে প্রেমিক মনের সহজ-স্বাভাবিক আত্মসমর্পণ। সহজভাবে প্রেমিকা বা ঈশ্বরের কাছে তিনি নিবেদন করেন নিজেকে— "বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;/তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে/আমি কি তোমার কাছে আসতুম ভুলেও কখনো?" আবার তীব্র বিদগ্ধ ভাষায় লেখেন তিনি— "কোন্‌খনি ভাষা বলেছিল পাখি গহন সন্ধ্যাবেলা/ভাঙা মান্দাস ভেলা" প্রভৃতি। নতুন বাংলা শব্দ ব্যবহার বা বাংলা ভাষার অসাধারণ কাব্যিক ব্যাপ্তি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

এই দুই কবির পাশাপাশি আর একজন অতি মেধাবী কবি হলেন আলোক সরকার। প্রকৃতি চেতনাই তাঁর সমস্ত কবিতার প্রধান কিংবা একমাত্র বিষয়বস্তুও বলা যায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উতল নির্জন' (১৯৫০)। প্রথম থেকে 'নিশীথ বৃক্ষ" (১৯৮২) পর্যন্ত বত্রিশ বছরের বিভিন্ন কবিতায় প্রকৃতি চেতনায় প্রথমে বিস্ময়ের অনুভূতি, পরে বিস্ময়ের উপলব্ধি, তার পরে বিস্ময়ের বিশ্লেষণ এবং বিস্ময়ের স্বরূপ নির্ণয় এই স্তরগুলি লক্ষণীয়।

২.৯.২ ষাটের দশকের বাংলা কবিতা

এই দশকের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় তাত্ত্বিকতা প্রবণতা। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো কবিরা ষাটের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। পবিত্র মুখোপাধ্যায় জীবনের প্রতি আস্তিকতা পোষণ করেছেন ঠিকই কিন্তু রত্নেশ্বর হাজরা জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেননি তেমনভাবে। তাই তার কবিতার পংক্তিরা আসে এভাবে— 'গভীর অর্থে কোনো কিছুই চিরায়ত নয়/না সত্যরা না মিথ্যারা/এমনকি ব্রহ্মের বোধ, লোকায়ত ধ্যান/গভীর অর্থে কোনো মানুষ সুখেও নেই, দুঃখেও নেই....'

মরমি অথচ রহস্যের আভাসে আবৃত কবিতা লিখেছেন এই সময়ে মৃণাল দত্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অরুণাভ দাশগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পাশাপাশি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাওয়া গেল বুদ্ধির ঝলক, কোন অস্পষ্টতা নেই, ভান নেই— 'আমরা যার সঙ্গে নিত্য বসবাস করি/তার নাম প্রেম নয় উদ্‌বেগ।/প্রেম অতিথির মতো/কখনও ঢুকে পড়ে অল্প হেসে,/সমস্ত বাড়িতে স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে/হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।'

আর সাধারণ মানুষের কথা, এই দশকের দেশকালের উত্তাপ, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। কবিতা নিয়ে নানারকম নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন পুষ্কর দাশগুপ্ত। আর এই সব কবিদের পাশাপাশি ষাটের দশকে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির একটা প্রাণবন্ত ধারা বয়ে চলেছিল, তাঁরা হলেন— ভাস্কর চক্রবর্তী, শামসের আনোয়ার, বেলাল চৌধুরী, তুষার রায়, অরুনেশ

ঘোষ, দেবারতি মিত্র প্রমুখ। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততাই এঁদের কবিতায় প্রধান স্থান করে নিয়েছে।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে সারা দেশ জুড়ে গড়ে উঠছিল ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গও বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ছিল না। ১৯৬৭-তে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষক আন্দোলন ঘটে। এইভাবে সত্তর দশকের সমস্ত পটভূমি জুড়ে কাজ করেছে সামাজিক রাজনৈতিক উত্তাল দশা। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের কবিতায় গড়ে ওঠে সেই সমাজ সচেতনতার সুর। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্তের পাশাপাশি সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস আচার্য, সব্যসাচী দেব, রঞ্জিত গুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিও সামিল হলেন এই বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাবধারায় কবিতা রচনায়।

আর এই পথের সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে অন্য রসে কবিতা লিখলেন সত্তর দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি জয় গোস্বামী। তাঁর প্রেমের কবিতা এক অর্থে হয়ে উঠল প্রতিবাদের কবিতা। কারণ কবি যখন সামাজিক অন্যায় গুলোকে ভ্রূক্ষেপ না করে গান শোনাতে চান তখন তাতে পোষণ করা হয় প্রতিবাদেরই সুর। তাঁর আত্মপ্রকাশ 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ' (১৯৭৭) দিয়ে। সমকালকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রথাগত জীবনের প্রতি আস্থাহীনতা এবং প্রেমের প্রতি বিশ্বাস তাঁর কবিতার মূল আকর্ষণ। খুব কোমল আল্‌তো উচ্চারণে তিনি প্রেমের কবিতা প্রতিবাদের কবিতা লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ— 'পাগলী তোমার সঙ্গে', 'ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা', 'উমাদের পাঠক্রম', 'ওঃ স্বপ্ন' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এই দীর্ঘ পথযাত্রায় সমাজ-পরিবর্তন যেমন বড় ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি বিভিন্ন কাব্য আন্দোলন ও আধুনিক কবিতা পত্রিকার প্রকাশ কবিদের বারবার পথ দেখিয়েছে। যেমন পঞ্চাশের দশকে দুটি পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়— 'শতভিষা' (১৯৫১, সম্পাদক— আলোক সরকার, দীপাঙ্কর দাশগুপ্ত, তরুণ মিত্র) এবং 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩, সম্পাদক— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী)। এই সময়ের কবিদের দুঃসাহসিক ভূমিকার অন্য উৎস হল- ১৯৬১-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রকাশিত হাংরি বুলেটিন, ১৯৬২-র এপ্রিলে প্রকাশিত 'হাংরি জেনারেশন'। এর প্রধান পরিকল্পনা মলয় রায়চৌধুরীর, সঙ্গে ছিলেন দেবী রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সমীর রায়চৌধুরী, উৎপল কুমার বসুর মতো কবিরা। এঁদের লক্ষ্য ছিল— সমস্ত রকম বন্দন থেকে আত্মার মুক্তিসাধন এবং যাবতীয় সামাজিক ও সাহিত্যিক সংস্কার সাধন। ১৯৬৫-র এপ্রিলে প্রকাশিত হয় 'শ্রুতি' পত্রিকা (প্রবক্তা পুষ্কর দাশগুপ্ত) যা জন্ম দেয় শ্রুতি আন্দোলনের। এঁদের লক্ষ্য ছিল সমাজচেতনা ও রাজনীতির জটিলতা বর্জন করা, ছেদচিহ্নের বিলোপ, ব্যাকরণ বিরোধিতা, ছন্দ বিরোধিতা, মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষা-ব্যবহার। তবে শেষ পর্যন্ত কোন আন্দোলনই স্থায়ী হয়নি, বদলে গেছে কবিদের নিজস্ব জীবনদর্শনও। ফলে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ কবিতা ও দার্শনিক কবিতা চর্চার গোষ্ঠী, যার মুখপত্র 'কবিপত্র'। এভাবেই পঞ্চাশ থেকে ষাট, ষাট থেকে সত্তর দশকের কবিতা ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতার জগৎ, নিজস্ব সুর খুঁজে নেবার সময়কাল। এভাবেই মেয়েদের নিজস্ব কথা বলার ধারা শুরু হয়েছিল কবি কবিতা সিংহকে দিয়ে, যাঁর উত্তরসুরী— সুচেতা মিত্র, প্রতিমা রায়, দেবারতি মিত্র, কেতকী কুশারী ডাইসন,

বিজয়া মুখোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এভাবেই সময় ও প্রেক্ষাপট বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে কবিদের আত্মপ্রকাশের ধরন, কবিতার শৈলী। যার মাধ্যমে নির্ণীত হয়েছে বাংলা কবিতার আধুনিকতা।

২.১০ সংক্ষিপ্ত টীকা

ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বহু সাময়িক পত্রে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ২১টি কবিতা স্থান পেয়েছিল। অবশ্য কবির মৃত্যুর পর এর দ্বিতীয় সংস্করণে আরও ১৫টি অপ্রকাশিত কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার পূর্ববর্তী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে কবি প্রেমকে মুখ্যস্থান রূপে তুলে ধরেছেন। 'নারীকে ভালোবাসার নাম ব্যথা— প্রকৃতির নির্মল শুশ্রূষার তবু শেষে শান্তি আসে'— এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সর্বত্র। এই কাব্যে দেখা যায় প্রকরণের বিশিষ্ট ভঙ্গি। এখানে কবি দেশি-বিদেশী ছন্দ প্রকরণ নিয়ে নানা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কবি নিজস্ব চিন্তাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

বনলতা সেন ঃ

'বনলতা সেন' জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাব্য। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তুর মূলে কবির অন্তহীন প্রেমচেতনা নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আধুনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে কবির নতুন ভাবনা ও ব্যাখ্যা এক অন্যতম মাত্রা দান করেছে। এই কাব্যের অন্তর্গত বিখ্যাত কবিতাগুলি হ'ল - 'বনলতা সেন', 'সুচেতনা', 'শিকার', 'হায় চিল', 'নগ্ন নির্জন হাত' ইত্যাদি। এখানে বনলতা সেন কবির আবেগের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবির চিরকালের পথচলা— হাজার বছরের অনন্ত পথ পরিক্রমা অপরূপ ভাবে স্থায়িত্ব ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বনলতা সেনের প্রেমিক পুরুষ দুদণ্ডের শান্তির প্রার্থনা করেছেন। এই কাব্যে ধরা পড়েছে সমকালীন যুগচেতনা ও ইতিহাসচেতনা, তবে প্রেমচেতনাই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু। শব্দ প্রয়োগে, ছন্দবিন্যাসে, অলংকার সৃজনে ও প্রকৃতিক রূপ বর্ণনায়, আঙ্গিক ও ভাব উভয় দিক থেকেই একাব্য বাংলা সাহিত্যের অভিনব সৃষ্টি।

অর্কেষ্ট্রা ঃ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিণত কাব্য সৃষ্টির প্রথম ফসল 'অর্কেষ্ট্রা'। কাব্যটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে পঁচিশটি কবিতা রয়েছে। 'অর্কেষ্ট্রা' মূলত প্রেমের কাব্য। এর বিভিন্ন কবিতায় কবির প্রেমচেতনার বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কবির আত্মকথনই যেন এই কাব্যের কবিতাগুলিতে নায়কের জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে

এই কাব্যগ্রন্থে কবি সজ্ঞানে বা অবচেতন মনে একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের একাধিক পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেগুলি কবির মৌলিকতায় ভাস্কর হয়ে আছে। যেমন 'হৈমন্তী' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণিকের গান গেয়েছেন— "মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে/স্থান পাবে হে ক্ষণিকা।" এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন— "বাংলা কবিতার পদ লালিত্য এই গ্রন্থে (অর্কেষ্ট্রা) প্রত্যাখ্যাত এবং এতে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।"

'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা কবির ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত। এই কাব্যের ভাষা-শৈলীতে আছে চমক এবং মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ফেরারী ফৌজ ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভয়াবহ রূপ। এখানে মোট ৩৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর কয়েকটি কবিতায় আধুনিক জীবন সমস্যা অনুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন 'ফ্যান' কবিতাটিতে কবি তুলে ধরেছেন অসহায় মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি - 'রক্ত নয়, মাংস নয়/নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা/মানুষের সৎ ভাই চায় শুধু ফ্যান/তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।' এই কাব্যের কবিতাগুলিতে কবি একাধিক প্রতীক ব্যবহার করেছেন। যেমন সমাজের সুযোগ সন্ধানী কালোবাজারীর প্রতীক হিসেবে তিনি ইঁদুরের চিত্রকল্প টেনে এনেছেন। এই কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনদর্শন বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

সাগর থেকে ফেরা ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫৬খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের মোট কবিতা সংখ্যা ৩২টি। বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট, মূল্যবোধের বিবর্তন এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মূলবিষয়বস্তু। আধুনিক জীবনের হতাশা ইত্যাদির বিভিন্ন অনুষঙ্গ এখানে স্থান পেয়েছে। এই কাব্যে কবি মিথের অসাধারণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এর কবিতাগুলির বেশ কিছু কবিতায় প্রেমের পবিত্র পরশে দুর্গম, দুর্লঙ্ঘ্য পথ পাড়ি দেবার মতো সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। এই কাব্যের 'আবিষ্কার' কবিতায় শোনা যায় জনৈক নাবিকের এক মৃত মহাদেশ পরিভ্রমণের কথা— "নিঃসঙ্গ নাবিক ফের/বাঁধি পোত শ্মশান-বন্দরে/তরীর কঙ্কাল যত, সেখানে বিছানো স্তরে স্তরে/-দুঃসাহসী দুরাশাবশেষ।"

'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির ভাষা আবেগ বহুল এবং শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের দ্রুত লয়ের গতিতে কবিতায় এসেছে প্রাণের আবেগ-মূর্ছনা।

বন্দীর বন্দনা ঃ

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১০টি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলি - 'কল্লোল' ও 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ প্রথম সার্থক রূপ নিয়েছে

এই কাব্যে। বাসনার অন্ধকারের মধ্যে কবি অবরুদ্ধ, সুন্দর ও কল্যানের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত, সেইজন্য কবির মানসে নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। কবির মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে— 'মানুষ কিভাবে দুর্বল, পঙ্গু, অসহায়?' সেই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুতে।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের আরও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। দেহগত প্রেম-চেতনা এই কাব্যে ফুটে উঠেছে। প্রেমের লোকোত্তর দেহাতীত রূপ নয়, কবি এখানে যেন প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, তিনি যেন নিয়ত দেহজ কামনার শাপে বিদগ্ধ। তাই কবি বলেছে - "বাসনার বক্ষ মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন", কবি বলেছেন - "যৌবন আমার অভিশাপ'। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্যটি স্মরণীয় - "বুদ্ধদেবের মনের ধর্ম প্রেম। তিনি প্রেমের কবি। এই জন্য তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ তথা 'বন্দীর বন্দনা' প্রধানত প্রেমের কাব্য। কিন্তু এ প্রেম রোমান্টিক প্রেম নয় ...।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রেমের বিরুদ্ধে এই কাব্যে যে দেহগত প্রেম-চেতনা ফুটে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২.১১ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করলে আমরা দেখব— রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় ভাব-অঙ্গিক-বিষয়বস্তু সমস্ত দিক থেকেই রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব কার্যকরী হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতায় দেখা গেছে জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি একই সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণা, নৈরাশ্যবাদ ও মৃত্যুচেতনা, আবার অন্ধকারের মধ্যেও সূক্ষ্ম আশার কিরণ। আবার জীবনের জটিল পথে মনের গোপন গতির যে যন্ত্রণা প্রকাশিত, তাই অনেকটা কৌশলী ও স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে বিষ্ণু দে'র কবিতায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা গেল ধ্রুপদী ভাষার প্রতি আস্থা, নাটকীয় স্বগত ভাষণের ভঙ্গি এবং কাব্যে শত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও এক রোমান্টিক স্বাদ ও সৌন্দর্য। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত পথে গভীর আশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণে আধুনিকতা ঘোষণা করলেন অমিয় চক্রবর্তী। সমর সেন ভিন্ন সুরের গাঢ়-সংহত গদ্যকবিতা রচনায় উৎকর্ষ দেখালেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নতুন ব্যক্তিত্বে কবিতায় স্থায়ীভাবে নিয়ে এলেন সাম্যবাদের মূল সুর।

পঞ্চাশ ও ষাঠের দশকের কবিদের কবিতায় আরও নতুন নতুন রচনারীতি, ভাব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

২.১২ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ১ দ্রষ্টব্য।

২.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার সংগঠনে নিম্নলিখিত যে কোনো একজন কবির কৃতিত্ব পরিমাপ করুন ঃ জীবনানন্দ দাশ; বিষ্ণু দে; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

২। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আধুনি বাংলা কবিতায় যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল, তার সবিশেষ পরিচয় দিন।

৩। কল্লোল-গোষ্ঠী কবিদের স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসেবে অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য কোথায় আলোচনা করুন।

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন।

৬। **টীকা লিখুন -**

বনলতা সেন; ধূসর পাণ্ডুলিপি; অর্কেস্ট্রা; ফেরারী ফৌজ; সাগর থেকে ফেরা, বন্দীর বন্দনা।

২.১৪ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের অন্তর্গত বিভাগ — ৪ দ্রষ্টব্য।

●●●

তৃতীয় বিভাগ

বাংলা নাটকের ইতিহাস— উনিশ শতক

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)
৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৩.২ মধুসূদন দত্ত
৩.৩ দীনবন্ধু মিত্র
৩.৪ গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৩.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩.৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৩.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা
৩.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৩.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৩.১১ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয় যেহেতু ইংরেজ চরিত্রের অঙ্গীভূত, তাই কলকাতাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই তারা নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিল। ইংরেজের অনুকরণে দেশীয় ধনী মান্যগন্য ব্যক্তিগণ নাটকাভিনয়ের কথা চিন্তা করেন এবং তারপর থেকে কলকাতার বাঙালি সমাজে নাটকাভিনয়ের প্রথা শুরু হয়। ইংরেজ স্থাপিত রঙ্গালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করল, কিন্তু সাধারণ মানুষ এ থেকে রসগ্রহণ করতে পারল না। ইংরেজি নাটকের ভাষা তাদের রসসম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নাট্যশালা স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন, যার ফলে অল্পকালের মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হল। সেগুলির মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি অন্যতম। এই সমস্ত নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বাংলা নাটকের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আঙিনায় নাট্যকারগণ এসে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন। আসুন, —মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই প্রধান পাঁচজন নাট্যকারের রচনাকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য রীতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণার দিনগুলিতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম। ইংরেজের অনুকরণে নাট্যশালা স্থাপন এবং এগুলিতে নাট্যাভিনয়ের চাহিদাই বাংলা নাটকের জন্ম-সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করে। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৌরাণিক, কাল্পনিক ও সামাজিক নাটকের উদ্ভব ঘটে। ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা ঘটে মধুসূদনের হাতে। আলোচ্য উপবিভাগে আমরা মধুসূদন থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের বিবর্তনের রূপরেখাটি চিহ্নিত করব, পরিচিত হব বাংলা নাটকের বহুবিধ রূপ-রীতির সঙ্গে। বাংলা নাটকের প্রধান প্রধান নাট্যকারদের রচনাও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে। এই উপবিভাগে বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসের আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনুসরণ করব বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে।

৩.২ মধুসূদন দত্ত

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মুক্তির পথটি যিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় চিহ্নিত করেছেন তিনি মধুসূদন দত্ত। বাংলা ভাষায় মঞ্চানুগ নাট্যধারায় তিনিই প্রথম উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেছিলেন। বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগের সুবাদে তিনি নাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে'র তরল আবহাওয়া থেকে রাঢ়-বঙ্গের জনসাধারণের উদ্ধারকল্পে তাঁর নাট্যরচনার শুরু। তিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজি নাট্যকলাকে অনুসরণ করার এবং ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে বাংলাভাষায় নাটক রচনা করেন, যার ফলে বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হল। সংঘাত-সঙ্কুল ঘটনার মাধ্যমে কাহিনির বিকাশ এবং জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি মধুসূদনের নাটকে প্রথম দেখা দিল।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মধুসূদন প্রথমে নাট্যকার হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামানারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত নাটক 'রত্নাবলী'-র অভিনয় দেখতে গিয়ে তাতে নাট্যগুণের অভাব লক্ষ করে তিনি নাট্য রচনায় প্রয়াসী হলেন, রচনা করলেন মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির কাহিনি অবলম্বনে নাটক—শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। পরবর্তীতে রচিত তাঁর নাটকগুলি হল— 'পদ্মাবতী' (১৮৬০); 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১); 'মায়াকানন' এবং অসমাপ্ত নাটক 'বিষ না ধনুর্গুণ'। তিনি দুটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)।

মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা। এই নাটকে তিনি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। এতে একটি প্রস্তাবনা-সংগীত ও উপসংহার-গীতি প্রথম সংস্করণে যুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে তা তুলে দেওয়া হয়। নাটকটির সংলাপ সংস্কৃতানুগ। এতে ঘটনা ও সংঘাতের তুলনায় বিবৃতি ও বর্ণনার প্রাধান্য লক্ষণীয়। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মাইকেল সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। তবে বাস্তবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দেবযানী চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল। শর্মিষ্ঠা চরিত্রে সংস্কৃত নাটকের নায়িকার চিরাচরিত

কোমল লালিত্য অনুসৃত হয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মাইকেল পাশ্চাত্য নাট্যকলার আদর্শকে জয়যুক্ত করতে পারেননি। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে প্রযুক্ত কৃত্রিম লিরিকের বাড়াবাড়ি এবং অতিনাটকীয়তার ফলে 'শর্মিষ্ঠা'র নাট্যরস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত। গ্রিক পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প 'অ্যাপল অব ডিসকর্ড' অবলম্বন করে তাকে ভারতীয় পুরাণের ছদ্মবেশে তিনি পরিবেশন করেছেন। এই নাটকের শচী মূলত গ্রিক পুরাণের ইন্দ্রাণী অর্থাৎ জুনো, মুরলা— প্যালাস, রতি— ভিনাস, ইন্দ্রনীল— প্যারিস ও পদ্মাবতী— হেলেন। চরিত্রগুলির ভারতীয় রূপায়ণে মধুসূদন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'শর্মিষ্ঠা'-র তুলনায় 'পদ্মাবতী' অধিকতর নাট্যগুণসমৃদ্ধ। তবে এই নাটকেও মাইকেল সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। বিবৃতি-বর্ণনা, সংস্কৃতানুগ সংলাপ ও আলংকারিকতা 'পদ্মাবতী'তে বহুলাংশে বর্তমান। নায়ক-নায়িকা ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী চরিত্র দুটি ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এই নাটকের দু-একটি স্থানে সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন মধুসূদন। বস্তুত 'পদ্মাবতী' নাটকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেন মাইকেল। সেদিক থেকে নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। টডের রাজস্থানের কাহিনি অবলম্বনে মধুসূদন এই নাটক রচনা করেন। টডের ঘটনাকে নাটকের প্রয়োজনে মধুসূদন সামান্য পরিবর্তিত করেছেন। রচনা, গ্রন্থনা, ঘটনা-সংঘাত ও সংলাপের দিকে থেকে এই নাটক মাইকেল-প্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী। এই নাটকে মাইকেল ইতিহাসের ঘটনাকে সুকৌশলে একটি মানব-রসপুষ্ট কাহিনিবৃত্তে রূপান্তরিত করেছেন। এবং এজন্যই নাটকটিতে মদনিকা-বিলাসবতী-ধনদাস-জগৎসিংহের উপকাহিনি সংযোজিত হয়েছে, যার ফলে ঈর্ষা, প্রেম, লোভ, চতুরতা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তবে পরিবারজীবন এবং ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হলেও মধুসূদন এই নাটককে শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের কাহিনিতে পরিণত করেননি, —এর চারপাশে একটি ঐতিহাসিক বিস্তারও তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর বেদনা এবং অসহায় ভীমসিংহের কাতরতা শুধু নয়, যুগসন্ধির সব বেদনা, অসহায়তা, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতাই যেন এই নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রাণা ভীমসিংহের ট্র্যাজিক ব্যর্থতা ও কৃষ্ণকুমারীর আখ্যানে করুণরসের উচ্ছ্বাস মধুসূদন অতি সংযতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ট্র্যাজেডি হিসাবে এই নাটক সম্পূর্ণরূপে সার্থক নয়। ভীমসিংহের অতিনাটকীয়তা ও কৃষ্ণার করুণরসের লিরিক মূর্ছনা ট্র্যাজিকধর্মী নাটকে বেমানান। ভীমসিংহ চরিত্রে দুর্বলতা এবং কৃষ্ণার নমনীয়তা ও বালিকাসুলভ সরল ভাব উভয়কেই করুণরসের চরিত্রে পরিণত করেছে, ট্র্যাজিক কাঠিন্য দান করতে পারেনি।

শেষ রোগশয্যায় মাইকেল 'মায়াকানন' নাটকটি রচনা করেন। এতে তিনি একটি অতীতাশ্রয়ী কাল্পনিক কাহিনির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। গল্পগঠন, চরিত্র চিত্রণ ও নাটকীয়তা কোনো দিক দিয়েই এর মূল্য খুব বেশি নয়। কবির শেষ জীবনের অবক্ষয়ের সুরটি এতে ধ্বনিত হয়েছে। রুষ্ট দৈবের সামনে মানুষের সমস্ত প্রয়াস কীভাবে ব্যর্থ হয় তারই মর্মান্তিক হাহাকারে এই নাটক পরিপূর্ণ।

'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি মাইকেল প্রতিভার অত্যুচ্চ আদর্শ বহন করছে। এই দুটি প্রহসনে বিষয়-ভাবনায়, বিশ্বাসে, নাট্যরস সৃষ্টিতে, সংলাপ রচনায়— সর্বত্রই সংস্কৃত প্রভাবকে পরিহার করা হয়েছে, ইংরেজি 'কমেডি অব ম্যানারস'-ই এদের আদর্শ। দুটি প্রহসনে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র যুগসংকট। নবযুগের উল্লাস উদ্বেলতার আড়ালে অর্বাচীনদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রাচীনদের বর্বরতা যে গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করেছিল সে— দিকে মাইকেল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আলোকপাত করেছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিছুটা নক্‌শাধর্মী, কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রায় সব দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণযুক্ত। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নব্য ইঙ্গ-বঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ছবি এঁকেছেন মধুসূদন, আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে আক্রমণ করেছেন গ্রাম্য বাংলার ধর্মের ধ্বজাধারী বৃদ্ধের অনাচার ও কুশ্রীতাকে। তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি, তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা এই প্রহসন দুটিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি স্রষ্টার মহৎ সামাজিক দায়বদ্ধতা এ দুটিতে নাট্যায়িত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' প্রহসনটি রচনা করেছিলেন। উভয় প্রহসনেই মধুসূদনের চরিত্র চিত্রণ প্রতিভা ও সংলাপ-ব্যবহার-নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রহসন দুটিতে মধুসূদনের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে।

বস্তুত, আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ প্রদর্শক মাইকেল মধুসূদন। মহাকবি হয়েও তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে মৌলিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে চমৎকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। রাঢ়-বঙ্গের অধিবাসীদের কুনাট্য প্রীতি দূর করে যথার্থ নাটকের আস্বাদ দান করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.৩ দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকের অঙ্গুলিমেয় দু-একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অন্যতম। মধুসূদনের অব্যবহিত পরেই বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হন। মূলত মধুসূদন-দীনবন্ধুর যুগ্ম সাধনাতেই বাংলা নাটক প্রাথমিক পর্বের নানা দুর্বলতা ও অসংগতি কাটিয়ে ওঠে।

প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছু রঙ্গ-রসের কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি তাঁর নাটকগুলির জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছেন। সরকারী কর্মসূত্রে নানা স্থানে যাতায়াতের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর নাটক ও প্রহসনগুলি সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার বহু পরিচয় বহন করেছে। তাঁর নাটকগুলিতে প্রবাহিত অন্তর্লীন এক কৌতুকরসসিক্ত প্রসন্নতার প্রবাহ পাঠকদর্শকের অন্তরকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তাঁর রচিত নাটক ও প্রহসনগুলির তালিকা নিম্নরূপ : নীলদর্পণ (১৮৬০); নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩); বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬); সধবার একাদশী (১৮৬৬); লীলাবতী (১৮৬৭); জামাই বারিক (১৮৭২) ও কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক সেকালের সমাজজীবনে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এর সমগোত্রীয়। ইংরেজ নীলকর সাহেবরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাংলার চাষীদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তারই বাস্তব ও মর্মন্তুদ চিত্র

'নীলদর্পণে' স্থান লাভ করেছে। একটি বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনার বিস্তার ঘটলেও এতে নীলচাষীদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার, ইংরেজ আদালতের পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থা, নবীনমাধব-তোরাপদের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা বাঙালির জাতীয় চেতনাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। কলকাতার এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যে তুমুল আলোড়ন গড়ে তুলেছিলেন, নীলদর্পণ তাতে ভাবাবেগের সঞ্চার সরল। এর মধ্যে যে বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নকে উদ্যত করে তোলা হয়েছিল, তা এদেশে ব্রিটিশবিরোধী মানসগঠনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নাটকটি শিল্প-শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারলেও এদিক দিয়ে এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

নাট্যসৌন্দর্যের মানদণ্ডে 'নীলদর্পণে' নানা দুর্বলতা রয়েছে। দীনবন্ধু এই নাটকে ট্র্যাজিক সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি। কাহিনি গ্রহণও সুসংহত নয়। নবীনমাধব ও ক্ষেত্রমণি কেন্দ্রিক কাহিনি দুটির মধ্যে অচ্ছেদ্য নিবিড়তা অনুপস্থিত। নবীনমাধবের পরিবারের করুণ কাহিনির যে বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে বৃহৎ কৃষকগোষ্ঠীর সর্বব্যাপক ট্র্যাজেডির বেদনা এবং স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য চাষীদের চরিত্রাঙ্কনে, পদীময়রানী, গোপী নায়েবের মতো ইতর-অভাজন মানুষের অন্তর-বেদনাকে দীনবন্ধু প্রাণবন্ত ভাষায় নাট্যায়িত করেছেন। এদের সংলাপের সপ্রাণ ভঙ্গি ও ব্যক্তিগত স্বরবৈশিষ্ট্য দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। নানা ত্রুটি থাকলেও সুকঠোর বাস্তবচিত্র, জনচরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের সহানুভূতি, সহজ কৌতুকরস, সমসাময়িক উত্তেজক পরিবেশের জন্য 'নীলদর্পণ' সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'নীলদর্পণ' রচনার পরে তিনি কৌতুক-কথার দিকে আকর্ষিত হলেন, রোমান্সরসে তৃপ্ত হতে চাইলেন। 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে কামিনী' এই ধরনের কৌতুকাশ্রয়ী মিলনে সমাপ্ত নাটক। নাটক হিসাবে এ দুটির উপযোগিতা তেমন নেই; রোমান্টিক প্রণয়কাহিনি রচনার প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না। তবে এগুলির পার্শ্বচরিত্র বর্ণনা এবং তাদের সরস কৌতুকপ্রবণ রূপায়ণ দীনবন্ধুর স্বাভাবিক প্রতিভার প্রকাশক। 'নবীন 'তপস্বিনী'-র 'জলধর' চরিত্র স্থূল হলেও উজ্জ্বল, লীলাবতীর হেমচাঁদ—নদেরচাঁদ প্রসঙ্গে প্রকাশিত কৌতুকরস উপভোগ্য।

'নীলদর্পণে'র পর কয়েকটি প্রহসন ও প্রহসনধর্মী নাটকের উপর নির্ভর করে দীনবন্ধুর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রহসনগুলিতে তাঁর উন্নততর রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে বিবাহ বাতিক গ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন প্রসঙ্গে সামাজিক ব্যঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তি চরিত্রের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে কৌতুকরসের উৎসার ঘটেছে। এর কাহিনি এবং চরিত্র নিতান্তই সাধারণ স্তরের। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টিতে এই নাটকটি অনেকাংশে সফল। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর প্রভাব এই নাটকে দুর্লক্ষ্য নয়। 'জামাই বারিক'-এ ধনবান পরিবারের ঘরজামাই পোষার প্রথাকে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে। এই নাটকের প্রধান ও অপ্রধান উভয় কাহিনিই সুগ্রন্থিত হয়েছে এবং হাস্য-পরিহাস ও কৌতুকরঙ্গে চরিত্রগুলো জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। জামাইদের মর্কটলীলা, বগী-বিন্দী এ দুই সতীনের কলহ, পদ্মলোচনের বিড়ম্বনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে রসিকতা প্রকাশিত, বাংলাদেশে তা প্রায় ক্লাসিক

পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এতে তিনি যে কৌতুকরস ও কমেডির আয়োজন করেছেন, অদ্যাবধি তার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'লীলাবতী'-তে সমসাময়িক নাগরিক জীবনের হাস্যপরিহাস ও নায়ক নায়িকার মিলন সংক্রান্ত একটি জটিল কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নায়ক ললিত এবং নায়িকা লীলাবতীর প্রণয় ও বিবাহ এর মূল ঘটনা হলেও দীনবন্ধুর হাতে তা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে। নদেরচাঁদ চরিত্রে যে কৌতুকরসের আয়োজন করা হয়েছে তা অদ্যাবধি অম্লান।

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর প্রতিভার অনন্য নিদর্শন। এই নাটক কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ-প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত। 'সধবার একাদশী' প্রহসন হিসাবে পরিচিত হলেও এতে ধরা পড়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের গোত্রলক্ষণ। নিমচাঁদ সে যুগের প্রতীর চরিত্র। উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হয়েও পানাসক্তিবশত তার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু চরিত্রহীন লম্পট সে নয়, শিক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে মাতলামির ঝোঁকেও সর্বদা সে আত্মসচেতন। তার জীবনের ব্যর্থতার হতাশা, আত্মগ্লানি ও মনোবেদনা চরিত্রটির সমস্ত অসংগতির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুত পরিহাস, ভাঁড়ামি, রঙ্গব্যঙ্গর আড়ালে সে নিজের ব্যর্থ জীবনের কান্নাকেই চাপা দিতে চেয়েছে, কিন্তু মুখের হাসিতে চোখের জল ঢাকা পড়েনি। তার চরিত্র ক্যারিকেচার অতিক্রম করে যথার্থ নাটকীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'সধবার একাদশী' বাংলা দুর্বল নাট্যসাহিত্যধারায় একটি সবল ও সজীব সংযোজন, এতে দীনবন্ধু শেক্সপিয়রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর রচিত সমস্ত নাটক-প্রহসনে সমান দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি, তবু বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশে এই নাটকগুলির অবদান কম নয়। তাঁর 'নীলদর্পণ', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি নিয়ে উনিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকের শৌখিন ও পেশাদার নাট্য সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নাটকগুলির অভিনয়ও বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের শহর ও শহরতলিতে নাট্যাভিনয় সংস্কৃতির বাহন হিসাবে দ্রুত প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর নাটকগুলি পাথেয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

৩.৪ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অভিনেতাদের গুরু হিসাবে পরিচিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ তাঁকে ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি একাধারে নট-নাট্যকার-নাট্য পরিচালক; পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের সমপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব দুর্লভ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়ের প্রতীক-পুরুষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনিই বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম পেশাদারিত্ব প্রবর্তন করেন। নাট্যাভিনয়কে তিনি একটি সুচারু শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, চরিত্রাভিনয়ে একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেন। নাট্যাভিনয় শিক্ষক হিসাবে তিনি নতুন 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানে অশিক্ষিতা পণ্যা রমণীকেও অসামান্যা অভিনেত্রীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের জগতে গিরিশচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা নাটকের বিকাশ ও জয়যাত্রা ঘোষিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চের ছোটোবড়ো বহু নাট্যকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর সমকালে দর্শকের রুচিকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুসৃত পাশ্চাত্য নাট্যধারার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মানসনৈকট্য ছিল না। জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে তিনি যাত্রার ধারাকে অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য ইউরোপীয় নাটকের বহিরঙ্গের ঘটনা-সংঘাতের যে তীব্রতা নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি যুগরুচির ও জনসাধারণের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে নাটকের ঘটনা সংঘাতের সঙ্গে রসের সাধনারও সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রতি তিনি যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ মধ্যযুগের ভক্তিভাবে তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। ধর্ম ও অলৌকিকতাকে ভক্তিভাবের আলোকে তিনি নাট্যায়িত করেছিলেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে তাঁর নাটকগুলি রচিত হয়েছিল এবং গিরিশচন্দ্র হিন্দু রিভাইভ্যেলিষ্ট হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। অস্পষ্টভাবে হলেও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, সামাজিক নাটকগুলিতেও সমকালীন সমাজচিত্রের নাট্যরূপ লক্ষ করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। প্রায় অনুরূপ সংখ্যক প্রহসন, পঞ্চরত্ন, রূপক, গীতিনাট্য ইত্যাদিও তিনি রচনা করেছেন। অবশ্য এই বিপুল সংখ্যক নাটক-নাটিকার অনেকগুলিই শুধুমাত্র দর্শক— চাহিদা নিবৃত্তির জন্য লিখিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাঁর নাটকগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

গীতিনাট্য ঃ

নাট্যজীবনের প্রথমাবস্থায় গিরিশচন্দ্র কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। সেগুলি হল— 'আগমনী' (১৮৭৭); 'অকালবোধন' (১৮৭৭); 'দোললীলা' (১৮৭৮); 'মোহিনী প্রতিমা' (১৮৮১)। প্রথমাবস্থায় এই নাটকগুলির অভিনয় দর্শক মনোরঞ্জনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু নাট্যগুণহীনতা ও সাহিত্যরসের অভাবের জন্য পরবর্তীকালে এগুলো অভিনীত হয়নি।

পৌরাণিত নাটক ঃ

গিরিশচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'শিবের বিবাহ'; 'রাসলীলা'; 'রাবণবধ'; 'সীতার বনবাস'; 'অভিমন্যুবধ'। এই নাটকগুলো ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'সীতার বিবাহ', 'ব্রজবিহার', 'সীতাহরণ'। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়— 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুব চরিত্র', 'নলদময়ন্তী', ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নাটকগুলি হল— 'কমলে কামিনী'; 'বৃষকেতু'; 'শ্রীবৎসচিন্তা'; 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। এছাড়াও তাঁর রচিত

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'প্রভাস যজ্ঞ' (১৮৮৫); 'মহাপূজা (১৮৯০); 'জনা' (১৮৯৩); 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০); 'মণিহরণ' (১৯০০); 'নন্দদুলাল' (১৯০০); 'হরগৌরী' (১৯০৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নাটক গীতিনাট্যের আঙ্গিকে রচিত।

গিরিশের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল— ধর্ম ও নীতিবোধের প্রচার, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাচুর্য, তরল ভক্তিরস ও মধ্যযুগীয় দেবতাদের উপর সুগভীর বিশ্বাস। তাঁর এই নাটকগুলিতে যাত্রা সুলভ সংগীতের প্রাচুর্য রয়েছে। অনেকসময় সরল ও লঘু কৌতুকের মাধ্যমে গভীর তত্ত্ব-উপদেশ এগুলিতে প্রচারিত হয়েছে। বিবেক-দয়া-স্নেহ-মোহ প্রভৃতিকে ব্যক্তিরূপ দিয়ে অনেকসময় গিরিশচন্দ্র এগুলিকে উপস্থিত করেছেন।

পৌরাণিক নাটক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'জনা'। 'পাণ্ডব গৌরবে'র বিষয়ের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। দণ্ডী এবং উর্বশীকে নিয়ে নাট্যকাহিনির উৎপত্তি হলেও এই নাটকে ভীম ও সুভদ্রাই প্রধান চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভীম চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকলেও ভক্তিভাবনার আধিক্যে তার শেষ পরিণতি যাত্রার অনুরূপ হয়েছে। 'জনা' নাটকে জনার মাতৃহৃদয় ও বীর নারীর অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্র অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। জনা চরিত্রের পরিকল্পনায় মধুসূদনের প্রভাব অনুভূত হলেও ভক্তিরস প্রাধান্যের ফলে নাটকটির ট্র্যাজিকরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গঙ্গাভক্তি, মাতৃভক্তি এবং কৃষ্ণভক্তির উচ্ছ্বাসে নাটকের ঘটনা-সংঘাত তরলীকৃত হয়ে পড়েছে। নাটকের বিদূষক চরিত্রটি ভাষাভঙ্গির লঘুদীপ্তি ও তাৎপর্যময় অর্থগূঢ়তার জন্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'রামের বনবাস'— প্রভৃতি নাটক কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে রচিত। 'অভিমন্যুবধ' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অবলম্বন করা হয়েছে মহাভারতের কাহিনি। 'কমলে কামিনী' চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি অনুসরণে রচিত। 'নলদময়ন্তী' এবং 'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটক দুটির মধ্যে কাহিনিগত সাদৃশ্য বর্তমান। 'নলদময়ন্তী'তে কলি কর্তৃক নলের লাঞ্ছনা এবং 'শ্রীবৎসচিন্তা'য় শনির দ্বারা শ্রীবৎসের দুর্দশার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই দুটি নাটকের পরিণতি মিলনান্তক।

গিরিশচন্দ্র রচিত 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪); 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫); 'রূপসনাতন' (১৮৮৭); 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮); 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'নসীরাম' (১৮৮৮); 'করমেতিবাঈ' (১৮৯৫); 'শঙ্করাচার্য' (১৮৯০); 'নিত্যানন্দ বিলাস' (১৯১১) প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও আধা-ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনাশ্রয়ী ধর্মমূলক নাটকগুলিকেও রস ও রূপের বিচারে পৌরাণিক নাটকের শ্রেণিভুক্ত করা চলে। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে বর্ণিত হয়েছে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে উত্তরণের সহজ ভক্তিরসাত্মক কাহিনি। 'চৈতন্যলীলা' রচিত হয়েছে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলা অবলম্বনে। 'শঙ্করাচার্য' নাটকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা স্থানলাভ করেছে। এই সমস্ত নাটকে উক্ত মনীষীদের মনুষ্যমহিমা আবিষ্কার বা ব্যাখ্যার পরিবর্তে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন এবং ভক্তিরস প্রচারেই গিরিশচন্দ্র

অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। পৌরাণিক নাটকগুলোতে গিরিশের খ্যাতি সর্বাধিক। ভারতীয় পুরাণের প্রধান প্রধান নৈতিক আদর্শ, ভক্তিনিষ্ঠা, প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর এই জাতীয় নাটকে পরিবেশন করেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক ঃ

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬); 'মীরকাশিম' (১৯০৬); 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭); 'অশোক' (১৯০৪); 'সৎনাম' (১৯০৪) ইত্যাদি গিরিশিচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক নাটকের কারবারি হয়েও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপ গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। সেই স্বাদেশিক অনুরাগ তাঁর এই ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই নাটকগুলিতে স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক বোধই একমাত্র আশ্রয় নয়। "অশোক' ও 'সৎনাম' নাটকে ধর্মভাব ও অলৌকিকতার আধিক্য আছে, 'সিরাজদ্দৌলা' চরিত্রে কর্মপ্রবণতা ও ভাবনাধিক্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সামান্য চেষ্টা লক্ষণীয়। পৌরাণিক বিদূষকের আদর্শে সৃষ্টি করিমচাচা চরিত্রটি কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। অকারণ স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থান-কাল-পাত্রের অনৈতিহাসিকতা, অতিনাটকীয়তা ও বাস্তবতাবোধের অভাব প্রকৃতির ফলে তাঁর এই পর্বের নাটকগুলি যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। যুগের দাবি পূরণ করতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরচনার লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে পারেননি।

সামাজিক নাটক ঃ

গিরিশচন্দ্র রচিত সামাজিক নাটকগুলিতে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। পারিবারিক কাহিনি নিয়ে লিখিত নাটকের মধ্যে অন্যতম হল— 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯); 'হারানিধি' (১৮৯০); 'মায়াবসান' (১৮৯৮); 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮) ইত্যাদি। এই নাটকগুলিকে তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবেও গ্রহণ করা যায়, তবে কোনো বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যা এগুলোতে প্রতিফলিত হয়নি। রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ-প্রচেষ্টার উদাহরণ এ জাতীয় নাটকে সুলভ। মদ্যাসক্তি, পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারী ও বিধবার বিবাহ সমস্যা, লাম্পট্য, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি প্রসঙ্গ তাঁর সামাজিক নাটকে পরপর প্রযুক্ত হয়েছে। এই ধরনের নাটকগুলিতে গিরিশের নানাবিধ নীতি উপদেশ পরিবেশন-প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত নাটকের মধ্যে প্রফুল্ল অধিকতর শ্রেষ্ঠ। এই নাটকটি গিরিশ প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। যোগেশের শ্রম ও নিষ্ঠায় গড়ে ওঠা একটি একান্নবর্তী পরিবার কী করে তার প্রশান্ত সমৃদ্ধি থেকে বিপর্যেয়ের চরমে পতিত হয়েছে এই নাটকে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির করুণরসাত্মক ও আবেগবহুল হলেও যথার্থ ট্র্যাজেডি এই নাটকে প্রকাশিত হয়নি। অতিনাটকীয়তা, খুন-জখম, মাতলামির বাড়াবাড়ির ফলে নাটকটির ট্র্যাজিকরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে সমকালীন সমাজের নিচুতলার মানুষের চরিত্রাঙ্কন এই নাটকে প্রাণবন্ত রূপ পেয়েছে। জগমণি কাঙালিচরণের মতো মূর্তিমান শয়তান,

ভজহরির মতো সহৃদয় জুয়াচোর, মদনের মতো বাউণ্ডুলে পাগল চরিত্রগুলি তাদের মুখের ভাষাসহ এই নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'মায়াবসান' নাটকে রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম এবং ক্ষমাধর্মের আদর্শে ধর্মনৈতিক ঐক্যবিধান দেশের পক্ষে কল্যাণকর— এই ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বলিদান' নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে কন্যাদানের প্রকৃত অর্থ। সমাজের বিধবা সমস্যা অবলম্বনে 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকটি রচিত। নাট্যকারের অন্য একটি নাটক 'গৃহলক্ষ্মী' ঘটনা ও চরিত্রাঙ্কনের দিক থেকে 'প্রফুল্ল' নাটকের পুনরাবর্তন মাত্র।

পঞ্চরং ও গীতিনাট্য ঃ

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি প্রহসন রচনা করেছিলেন, এগুলি পঞ্চরং নামে অভিহিত। 'সপ্তমীতে বিসর্জন'; 'বেল্লিক বাজার'; 'বড়দিনের বকশিস'; 'সভ্যতার পাণ্ডা' ইত্যাদি পঞ্চরংগুলির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের আমোদ-প্রমোদকে কেন্দ্র করে এগুলি রচিত। এগুলির আকার সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনাও নিতান্ত সাধারণ। অধিকাংশ প্রহসন ইতর পল্লির কদর্য আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। চরিত্রাঙ্কনে ধরা পড়েছে রসরুচিহীনতা। সংলাপে ধরা পড়েছে কলকাতার অশিষ্ট সমাজের ভাষা। অবশ্য বিদেশি নাটকের প্রভাবপুষ্ট 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' নাটকটি লঘু কমেডি হিসাবে উপভোগ্য। গিরিশচন্দ্র রচিত গীতিনাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'মলিনমালা'; 'মলিনা বিকাশ'; 'স্বপ্নের ফুল'; 'দেলদার' প্রভৃতি। তাঁর রচিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য 'আবুহুসেন'। এর কাহিনিটি যেমন কৌতুকাবহ, এতে প্রবাহিত রোমান্টিক ও হাস্যরসাত্মক সুরও তেমনি উপভোগ্য।

ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়েই গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি সংস্কার সাধন করেছেন। মধুসূদন-দীনবন্ধুর আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক নাট্যসংলাপ গিরিশের হাতেই সচলতা ও স্বাবলীলতা অর্জন কিরতে সক্ষম হল, নাটকীয় চরিত্রগুলি তাঁদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার অধিকার লাভ করল। তাঁর সংলাপের ভাষায় নাট্যগুণের প্রাচুর্য রয়েছে। কবিত্বের দ্বারা কোথাও সংলাপের স্বাভাবিকতা আচ্ছন্ন হয়নি। অতিভাষণের দোষ থেকেও তাঁর নাটকগুলি প্রায়শই মুক্ত। তাছাড়া তিনি তাঁর নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে এক ধরনের কবিতা সংলাপের প্রবর্তন করেছিলেন। মধুসূদনের চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে নিষ্কাশিত এই রীতি 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত লাভ করেছে, যা পরবর্তীকালে একাধিক নাট্যকার কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে।

৩.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো আত্মিক সম্পর্ক বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না, বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য, কিন্তু তিনিই বাংলা নাট্যসাহিত্যকে জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করলেন; বাংলা নাটকে বিচিত্র ধারাকে আহ্বান জানালেন। আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্র নাট্যসম্ভারকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি—

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ঃ

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-যৌবনে লিখিত কয়েকটি কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল। লিরিক আবেগের সঙ্গে নাটকীয় ঘটনার বিকাশ ও গীতিধর্মের মিশ্রণে এগুলিতে এক বিচিত্র রসের সৃষ্টি হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১); 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১); 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪); 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮); এবং পরিণত যৌবনে লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২); 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪); 'কাহিনী' (১৯০০)— ঐ সমস্ত রচনা কখনও নাট্যধর্মী কাব্য, কখনও কাব্যধর্মী নাটক, কখনও বা গীতিনাট্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য, নাটকের আধারে সংগীত পরিবেশনই এর মূল লক্ষ্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনা থেকে গৃহীত হয়েছে, এতে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র প্রভাবও রয়েছে। 'মায়ার খেলা' সখি সমিতির মহিলাদের দ্বারা অভিনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। প্রেমের বিচিত্র হাসিকান্নাই এর মূল বক্তব্য। এই সমস্ত নাটক-নাটিকাতে গানের সূত্রে ঘটনাধারা গ্রন্থিত হয়েছে, ফলে গীতিপ্রবনতাই এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'রুদ্রচণ্ড' কাব্যধর্মী হলেও কিশোর কবি এর মধ্যে কিছু নাটকীয় ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তত্ত্বপ্রধান রচনা। প্রেমের মধ্যেই আছে মুক্তি— এই ভাবনাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বিদায় অভিশাপ'-এ মহাভারতের কচ ও দেবযানীর চরিত্র দুটির মাধ্যমে প্রেমের রক্তরাগের ব্যর্থতা ও শেষে প্রসন্ন নির্বেদে পৌঁছানোর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'কাহিনী'তে প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, ও মহাকাব্যের চরিত্র এবং ঘটনা সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। 'কর্ণকুন্তি সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতিতে মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাটকের এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা'তে মহাভারতের অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমের গল্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাকে মৌলিক সৃষ্টির মর্যাদা দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নারী শুধু পুরুষের নর্ম সহচরী নয়, সে তার সুখ-দুঃখের অংশ ভাগিনী, সর্বকর্মের সঙ্গে যুক্ত— চিত্রাঙ্গদাতে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ঘটনাবস্তু, চরিত্র, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের মধ্যে 'চিত্রঙ্গদা'র স্থান সর্বোচ্চ।

নিয়মানুগ নাটক ঃ

রবীন্দ্র প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসারে কয়েকটি পঞ্চাঙ্ক নাটকও রচনা করেছেন, সেগুলি হল— 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯); 'বিসর্জন' (১৮৯০); 'মালিনী' (১৮৯৬); 'মুকুট' (১৯০৮); 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৯০)। 'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি। রাজা বিক্রম ও রানি সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বের উপর নাটকটি গড়ে উঠেছে। আকাঙ্ক্ষার পীড়ন থেকে স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তাকে পরিত্যাগ এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চূড়ান্ত বেদনার মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি— এই আদর্শকে কবি অনেকটা শেক্সপিয়রীয় রীতিতে বর্ণনা করেছেন। কুমারসেন ও ইলার উপকাহিনির অত্যধিক বিস্তারের ফলে নাটকের শেষাংশে মূল কাহিনি আচ্ছন্ন হয়েছে। এর রচনাংশ, চরিত্রচিত্রণও কাহিনি গ্রন্থনে দুর্বলতার যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে। একই বিষয়কে অবলম্বন

করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'তপতী' (১৯২৯) নামে ভিন্ন রসের আরেকটি নাটক রচনা করেন। এটি গদ্যনাটক।

'রাজা ও রানী'র দুর্বলতা 'বিসর্জনে' অনেকাংশেই সংশোধিত হয়েছে। এই নাটকে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বে প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতিকে কেন্দ্র করে নাটকে এই দ্বন্দ্ব তৈরি করা হয়েছে। প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী রঘুপতির হৃদয়ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে তার পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মহত্যার মাধ্যমে। জয়সিংহের আত্মযন্ত্রণা ও তারই পরিণতিতে আত্মহনন নাটকের ট্র্যাজিক তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। রঘুপতির বেদনার মাধ্যমে প্রেম ও কল্যাণের জয় ধ্বনিত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্যের কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে নাট্যকারের আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি প্রতাপাদিত্যের কাল্পনিক কাহিনির ভিত্তিতে রচিত। নাট্যরচনা হিসাবে এটি দুর্বল। যাত্রার বিবেক-সুলভ গীতিপ্রধান আদর্শের প্রতীকধর্মী চরিত্রের নবরূপায়ণ লক্ষ করা যায় ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটিতে। রবীন্দ্রনাট্যে এই জাতীয় চরিত্র পরবর্তীকালে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 'মুকুট' নাটকটি বোলপুরের আশ্রম বালকদের উদ্দেশ্যে রচিত। ত্রিপুরার রাজবাড়ির সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় কবি এই নাটকে বালক মনের উপযোগী মহান আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। 'নটীর পূজা'য় (১৯২৬) নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকলেও এতে ঘটনাগত তীব্রতা রয়েছে। আদর্শবাদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-চিত্রণ নিপুণতা এতে প্রশংসনীয়। বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় এক মহান আত্মত্যাগের কাহিনি এতে ভাষা পেয়েছে। 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) নাটকটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেরই রূপান্তর মাত্র। 'বাঁশরী' (১৯৩৩) নাটকটি নাট্যগুণসমৃদ্ধ নয়, তবে সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও বৈদগ্ধ এবং সমস্যার আধুনিকতার জন্য এটি উল্লেখযোগ্য।

কৌতুকনাট্য :

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কৌতুকরসের নাটকও রচনা করেছেন। প্রচলিত বাংলা প্রহসন থেকে এগুলি স্বতন্ত্র, এদের স্বাদ ভিন্ন। এই শ্রেণির নাটকগুলিতে সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোনো ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়নি, বরং এগুলোতে আছে মননশীলতার স্পর্শ। এই নাটকগুলির প্রসন্ন কৌতুকরস, বুদ্ধিগ্রাহ্য বাক্‌বৈদগ্ধ, ঘটনা পরিস্থিতির হাস্যকর অসংগতি প্রভৃতি নাট্য-কৌশল যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাটকগুলি হল— 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২); এর মার্জিত রূপ 'শেষ রক্ষা' (১৯২৮); 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭); 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬); 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭); 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭)। পূর্ণাঙ্গ রঙ্গনাট্যগুলির মধ্যে 'গোড়াল গলদ' সার্থকতম রচনা। নাটকটি হাস্যরসে উজ্জ্বল। নানা ধরনের চরিত্রের কাণ্ড-কারখানার মধ্যে একমাত্র বিনোদের প্রসঙ্গে এই নাটকে সামান্য স্বতন্ত্র সুর সংযোজিত হয়েছে। চিরকুমারদের সারাজীবন বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞা কীভাবে কিশোরীদের সামান্য স্পর্শে ভেঙে পড়ল, তারই এক কৌতুককর আলেখ্য রচিত হয়েছে চিরকুমার সভা নাটকে। হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকে নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে দেশি-বিদেশি বিচিত্র রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য়

স্ত্রীভূমিকা বর্জিত সরস কৌতুকের সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে এক স্নিগ্ধ করুণরসের প্রচ্ছন্ন ধারা। এই নাটকের বাক্‌বৈদগ্ধ বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নাটকগুলি জনপ্রিয় না হলেও কৌতুকনাট্যের ক্রমবিকাশে এগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

রূপক, সাংকেতিক ও তত্ত্বনাটক ঃ

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই অভিনব নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন। এই রীতিতে লিখিত নাটকগুলি রূপক ও সাংকেতিক তত্ত্বনাটক হিসাবেই পরিচিত। 'শারদোৎসব' (১৯০৮); 'রাজা' (১৯১০); [অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' (১৯২০)]; 'অচলায়তন' (১৯১২); [অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত রূপ 'গুরু' (১৯১৮)]; 'ডাকঘর' (১৯১২); 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫); 'রক্তকরবী' (১৯২৬); 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের জীবনের তাত্ত্বিক সত্য আবিষ্কারের ব্যাকুলতা, জীবনরহস্যকে জানার অপার কৌতূহল তাঁকে এই শ্রেণির নাটক রচনায় প্রণোদিত করতে পারে। এই নাটকগুলিতে আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি নানা অভিনবত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কোনো নাটকের নায়ক আদ্যন্ত মঞ্চের বাইরে অবস্থান করেছে, তার কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছে মাত্র; কোথাও নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একবারও মঞ্চে আসেনি, কোথাও গোটা নাটকটিই একটি মাত্র সংহত দৃশ্যে পরিবেশিত। কোথাও গানে গানে যাত্রার সুর ভেসে এসেছে, আবার কোনো নাটকে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ নেই শুধু সংলাপ পরপর সাজানো রয়েছে, কোনো নাটকে দেখা যায় যে একদল লোক ঘুরে ঘুরে কয়েকটি সংগীতমন্ত্র জপ করে চলেছে— নাট্যাঙ্গিকের এই বৈচিত্র্য ভাব ও রূপের দিক থেকে তাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে।

'শারদোৎসবে' ঋণ পরিশোধের পটভূমিকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মিলনসত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব অপূর্ব সংগীত মূর্ছনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তবু একে সাংকেতিক নাটক বলা যায় না। ঠাকুরদা ও ছেলের দল মিলে গানে গানে নাকটকটিকে একটি নতুন স্বাদ দিয়েছে। 'রাজা' থেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাংকেতিক নাটকের রচনা আরম্ভ। এই নাটকে রানি সুদর্শনার রূপাকাঙ্ক্ষা থেকে রূপাতীতের চেতনায় উত্তরণের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। ছদ্মবেশী রাজার আসল পরিচয় লাভ করতে চেয়েছেন রানি। এই রাজাই চরম সত্য। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক। মানবচিত্তের বহুমুখী প্রবণতাই এই নাটকে পাত্র পাত্রীর রূপ ধরে এসেছে।

'ডাকঘর' নাটকের ভাববস্তুটি চমৎকার। জীবনযাত্রার এক বিচিত্র রূপ অমলের কামনা এবং অপ্রাপ্তিতে জড়িত হয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নাটকটি সহজ জীবনের রাস্তা থেকে গূঢ় আত্মার নির্জন রহস্যময়তায় নিমজ্জিত হয়েছে। গৃহবন্দী রোগাক্রান্ত অমলের প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যে মুক্তিলাভ করার কামনার মাধ্যমে মানবাত্মার চিরন্তন মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। ডাকঘর এখানে অসীম ঈশ্বরের সীমার প্রতীক।

'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-মৃত্যু, শীত-বসন্ত, জরা-যৌবনের দ্বৈতসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের পটভূমিকায় এক নতুন ঋতুনাট্যের পরিকল্পনা করেছেন। পাত্র-পাত্রীর নাম ছাড়াই এই নাটকে সংলাপের মালা গাঁথা হয়েছে। এদের ব্যক্তিত্বকে

আলাদাভাবে চিহ্নিত না করে সাধারণভাবে যৌবনকেই ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন কবি। যৌবনের মৃত্যু নেই, বার্ধক্যের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই, এদের লীলাতেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়— এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি একটি কাহিনিহীন সংলাপগুচ্ছে ধরে রাখা হয়েছে। আঙ্গিকের নবীনতা এঁতে লক্ষণীয়। মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে সংকুচিত করে, পাত্রের নামোল্লেখ না করে, সংখ্যা দিয়ে তাদের চিহ্নিত করে এক যৌথ চলার ভাব জাগাতে চেয়েছেন কবি; যাতে এক সামগ্রিক সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই যৌথ চলার ভাবই এখানে সাংকেতিকতায় অভিব্যক্ত।

'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'তাসের দেশ', 'অচলায়তন', 'কালের যাত্রা'য় আধুনিক যুগ-সমস্যাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। 'মুক্তধারা'য় কবি-মানসের অভিনব লোকে উত্তরণের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এই নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতির সৃষ্ট যন্ত্র প্রকৃতির সদামুক্ত প্রাণ-নির্ঝরকে বেঁধেছে। যন্ত্রকে নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ একালে মানবপ্রাণকে লাঞ্ছিত করছে দিকে দিকে— নাটকে তারই অবসান ঘটাতে চেয়েছেন কবি। কাহিনি ও চরিত্রগুলির সহজ মানবিক রসের বিন্দুমাত্র হানি না ঘটিয়ে আধুনিক সভ্যতার সংকটকে সামগ্রিকভাবে সংকেতিত করা হয়েছে। অভিজিৎ আত্মদান করে প্রাণ-নির্ঝরকে মুক্তি দিয়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকের মূল ভাববস্তু হল প্রাণের ও সৌন্দর্যের কাছে যন্ত্রের নতি স্বীকার। নন্দিনীর চরিত্রে প্রাণের ধর্ম তরঙ্গিত, নন্দিনীর মানবমূর্তি তাত্ত্বিক ভাবনার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। রঞ্জন চরিত্রে আছে যৌবনের তত্ত্ব। নাটকটি একটি মাত্র দৃশ্যে রচিত। মঞ্চে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে মূল চরিত্র নন্দিনী যোগসূত্র রচনা করে চলেছে। রাজা সর্বদা জালের আড়ালে অদৃশ্য এবং রঞ্জন সর্বদা রয়েছে দৃশ্যের অন্তরালে। রাজা চরিত্র শক্তির প্রচণ্ডতায় দৃপ্ত এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের বেদনায় তিনি দীর্ণ। রাজার মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তির এবং যন্ত্রযুগের গোটা মানব সভ্যতার ঐশ্বর্য ও বেদনার কথা সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন নাট্যকার। প্রাণের গৌরবে ও সৌন্দর্যের মহিমায় নন্দিনী চরিত্র রবীন্দ্র সৃষ্টির এক বিশেষ সম্পদ। প্রাণের সঙ্গে যন্ত্রের, প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমের, প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার, শ্রমজীবী ও শ্রমশোষকদের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্য ও প্রাণের জয়লাভ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। 'রক্তকরবী' ফুল প্রাণের এই সৌন্দর্য ও বিদ্রোহের প্রতীক। 'অচলায়তনে' মধ্যযুগের সংস্কার ও নিয়মের অত্যাচার প্রাণের মুক্তিতে বাধা দিয়েছে। শেষপর্যন্ত সেই অচলায়তন ভেঙে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের প্রতিটি নাটকের গান নাটকগুলিকে এক বিশেষ শৈল্পিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে। কোনো কোনো গান নাটকের মর্মসংগতি হিসাবে নাট্যকারের আত্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। 'তাসের দেশ' নাটকটি নৃত্যগীত প্রধান হলেও রূপকার্থের স্পষ্টতার জন্য তা আধুনিক জীবনসভ্যতার ও সমস্যার অনুষঙ্গবাহী হয়ে উঠেছে। ছকবাঁধা সংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের জীবনভাবনার রূপক হিসাবে গৃহীত হয়েছে তাস চরিত্রগুলি ও তাদের রূপকথাসুলভ জীবনযাত্রা। বিদেশি রাজপুত্র এখানে অন্ধ নিয়মের বশীভূত জড় ও প্রাণহীন ভূখণ্ডে প্রাণবন্যাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে। 'কালের যাত্রা'র মধ্যে প্রধান 'রথের রশি'তে শ্রমজীবী মানুষের জয়গান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকের বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল ও প্রতীক বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতীক নাট্যকারের সমকক্ষই শুধু নয়, কখনও উৎকৃষ্টতর— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নৃত্যনাট্য ঃ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনে কয়েকটি নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। সেগুলি হল 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬);"চণ্ডালিকা' (১৯৩৭); 'শ্যামা' (১৯৩৯)। এগুলিতে নৃত্যকলা, অভিনয় ও সংগীতের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। এগুলির জনপ্রিয়তা অদ্যাবধি অম্লান। অবশ্য নৃত্য-নিরপেক্ষ গীতিনাট্য হিসাবেও এগুলির পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন সম্ভব।

এছাড়া সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক-নাটিকা আছে। যেমন— 'শোধবোধ' (১৯২৬); 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) ইত্যাদি। 'গৃহপ্রবেশ' বাস্তব পরিবেশের সামাজিক নাটক হলেও এতে রূপক-প্রতীকের কিছু প্রভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলি ভাবগর্বী, তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবানুভূতির এবং অনন্যতার প্রকাশক— যেখানে সাধারণের অনুপ্রবেশ তেমনভাবে ঘটেনি। তাঁর অনেক নাটক, বিশেষ করে প্রতীক নাটকগুলি এখনও অননুকরণীয়। এগুলির দ্বারাই তিনি কালজয়ী নাট্যকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৩.৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতম রূপ যাঁর প্রতিভাস্পর্শে সমহিমায় উদ্ভাসিত হল, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ও পরে ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হলেও তাঁর লেখনীতেই এর পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হল। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং স্বভাবগত কবিত্বশক্তি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজগতে আবির্ভূত হলেন। পুরাণের ভক্তিতরলতা থেকে বাংলা নাটককে উদ্ধার করে নতুন পথে চালিত করলেন, ইউরোপীয় নাটকের পথকে তিনি অনুসরণ করলেন, নাটকে নিয়ে এলেন স্বাদেশিক বোধসম্পন্ন মৈত্রী ভাবনা।

হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই গানের সূত্রেই তিনি নাট্যজগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর নাট্যজীবনের প্রথমদিকে তিনি কয়েকটি প্রহসন রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল— 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫); 'বিরহ' (১৮৯৭); 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০); 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২); 'পুনর্জন্ম' (১৯১১); 'আনন্দবিদায়' (১৯১২)। এই প্রহসনগুলি রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত ধারার তুলনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলির অভিনয়ও একদা জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে এদের সবগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। 'কল্কি অবতার' প্রহসনটি ছড়ার মতো মিত্রাক্ষরে আদ্যন্ত রচিত। এতে বিলাতফেরত, ব্রাহ্ম, নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিত—এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। পরিশেষে কল্কিদেব বিবাদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন ঘটালেন। এবং সকলে বুঝতে পারল বিশ্বাস প্রেম ও মনুষ্যত্বের উপরই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি নির্ভরশীল। 'বিরহ'— বিশুদ্ধ প্রহসন। স্বল্প আয়তনের মধ্যে 'বিরহে'র প্রকৃত হাস্যরস অংশটুকু প্রকাশ করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত সন্দেহ নিরসনের মাধ্যমে প্রহসনটির কৌতুকরস প্রকাশ পেয়েছে। 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রহসনটি নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনে বিলাতফেরত নব্যহিন্দু ও শিক্ষিতা রমণীদের নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। 'পুনর্জন্ম' প্রহসনে জটিল ঘটনা-বিপর্যয়ের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আনন্দবিদায়' নামে রঙ্গ

প্রহসনটিতে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার ফলে রুচিবান পাঠকদর্শক কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসাবে 'আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে... তবে এর কোনো কোনো অংশ যে নাট্যকারের রচনাকৌশলের পরিচয়বাহী, ... অস্বীকার করা যায় না।

পুরাণাশ্রিত নাটক রচনার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত নাট্যধারায় প্রবল আঘাত হেনেছিলেন। তিনি পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাব নিয়ে আসতে চাইলেন। 'সীতা' (১৯০৮); 'পাষাণী' (১৯০০); 'ভীষ্ম' (১৯১৪)— এই নাটকগুলির কোথাও মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ, গিরিশ-সুলভ যাত্রারীতির কোনো অনুসরণ নেই, নেই ভক্তিরসের স্পর্শ। তাঁর বস্তুবাদী ইহসর্বস্ব মন পৌরাণিক ও দেবদেবী চরিত্রের অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিল না। 'পাষাণী' নাটকে নাট্যকার রামায়ণের অহল্যা-কাহিনিকে এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান করলেন। রামায়ণ ও ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে 'সীতা' নাটকটি রচিত হয়েছে। এই নাটকের সীতা চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রীতি, রাম চরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমচেতনার দ্বন্দ্ব এবং বশিষ্ঠের চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ছবি আছে। 'ভীষ্ম' নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে সহজ হৃদয়বৃত্তির দ্বান্দ্বিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নাট্যকার এখানে কর্তব্য ও চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে জীবনসত্যের খোঁজ করেছেন। নাট্যকারের অন্বিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমস্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও চরিত্রকে সমকালীন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। নানা ধরনের শিথিলতা, অতিমাত্রায় কবিত্ব, ঘটনা ও আবেগের অসামঞ্জস্যের ফলে নাট্যরচনা হিসাবে এগুলি যদিও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, তবু পুরাণাশ্রিত নাটকে নব্যধারা প্রবর্তনের যে সাধনা দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন তার এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি সামাজিক নাটকও লিখেছেন— 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী (১৯১৩)। খুন, জখম, ফাঁসি, ইত্যাদি উত্তেজক ঘটনায় পূর্ণ বলে এগুলি একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নাট্যোৎকর্ষ এ দুটিতে বিশেষ নেই, সাহিত্য লক্ষণ আরও কম।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি। সেগুলি হল— 'তারাবাঈ' (১৯০৩); 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫); 'দুর্গাদাস' (১৯০৬); 'নুরজাহান' (১৯০৮); 'মেবার পতন' (১৯০৮); 'সাজাহান' (১৯০৯); 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১); ও 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। 'তারাবাঈ', 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটকে তিনি রাজপুত ইতিহাসের কাহিনি বিবৃত করেছেন। এই নাটকগুলিতে ইতিহাসের সত্যতা প্রায়শই রক্ষিত হয়েছে। রাজপুত ও মুসলমান সম্রাটদের সংঘর্ষই এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু। উনিশ ও বিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ এই সব নাটকের প্রধান সুর। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক প্রতাপের অতুল বীরত্ব, দেশপ্রেম ও অভাবিত ত্যাগের চিত্র। 'মেবার পতনে' নাট্যকার জাতীয়তাবাদের উপরে মানবমৈত্রীর আদর্শকে স্থাপিত করেছেন। 'তারাবাঈ'-তে ঐতিহাসিক নাটকের সংহত গাম্ভীর্য এবং অচপল ভাবাবেগ অপেক্ষা কৌতুকরসের উচ্ছ্বাস বেশি। 'দুর্গাদাস' নাটকে ঘটনার অতিরিক্ত আধিক্যে নাটকের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়েছে। সুলভ বীররসের অবতারণার ফলে নাটকের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে দ্বন্দ্বমূলক কাহিনি নির্মিতিতে এই নাটকগুলি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

মোগল জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নুরজাহান' এবং 'সাজাহান' নাটক দুটিতে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সিংহাসনকেন্দ্রিক হানাহানি, কামনা-বাসনার সংঘাত, ঈর্ষা, সৌন্দর্য, মদিরতা, বিলাসবিভ্রম ও জ্বালাময়ী মনোভাব এই দুটি নাটকের কাহিনিভিত্তি রচনা করেছে। মোগল যুগের ঐশ্বর্য ও রক্তাক্ত লোভের সংঘাতময় পটভূমিকায় মানুষের ব্যক্তিচরিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। 'নুরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহান। হৃদয়হীন সৌন্দর্যের অগ্নিদাহ, ক্ষমতালিপ্সু নুরজাহানের জীবন ও ভাগ্যকে ঘিরে যেভাবে আবর্তিত হয়েছে তার ট্র্যাজিক চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত জটিল ব্যক্তিত্বের প্রকাশক হিসাবে নুরজাহান বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। 'সাজাহান' নাটকে নাট্যকার সাজাহান চরিত্রের মধ্যে বিচারহীন পিতৃত্ব ও সম্রাটত্বের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন। সাজাহানের ট্র্যাজেডি তার অন্তর্দ্বন্দ্বজাত গভীর আত্ম-অবক্ষয়ে, মৃত্যুতে নয়। ঔরঙ্গজেব চরিত্রটি নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও সুপ্ত মানবতার মিশ্রণজাত এক বিচিত্র সৃষ্টি। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলিও সুচিত্রিত। মোরাদের স্বল্পবুদ্ধি, সুজার প্রণয়ব্যাকুলতা, পিয়ারার সংগীত ও সৌন্দর্যপ্রীতি, মহম্মদের সত্যনিষ্ঠা নাটকটিতে সুপরিস্ফুট হয়েছে। এই চরিত্রগুলি নাট্যকারের চরিত্রচিত্রণ প্রতিভার পরিচায়ক। নুরজাহান ও সাজাহান নাটক হিসাবে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও এ দুটিই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনা।

'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সিংহল বিজয়'। হিন্দুযুগ অবলম্বনে রচিত, এতে ইতিহাসের আনুগত্য আছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য চরিত্র নাট্যকারের অমর সৃষ্টি। এই নাটকে মানবচরিত্রে ব্যক্তিরহস্য প্রকাশের প্রতি নাট্যকারের পক্ষপাত লক্ষণীয়। চাণক্য চরিত্রে তিনি কঠোর হৃদয়হীন প্রতিজ্ঞানুসরণ ও কর্তব্যনিষ্ঠার আভ্যন্তরশূন্যতার ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন।

উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেও কোনো কোনো স্থলে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয় পরিস্থিতি যথেষ্ট কৃত্রিম হিসাবে প্রতিভাত হয়। ভাষার কৃত্রিমতা ও অতিনাটকীয়তা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মৌলিক ত্রুটি। নাটকের কুশীলবদের প্রত্যেকের মুখেই একধরনের কাব্যময় অলংকারবহুল ভাষা ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়েছে। তাঁর কাব্যধর্মী সংলাপ স্বতন্ত্র শিল্পরূপে মূল্যবান হলেও নাট্যবিচারে অবশ্যই দোষাবহ। অবশ্য রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আবদ্ধ থেকেও তিনি তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি। অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়ের যোগসূত্র স্থাপনে দ্বিজেন্দ্রলাল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৩.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা

কীর্তিবিলাস / জি. সি. গুপ্ত ঃ

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত খ্যাত জি. সি. গুপ্ত নামে। তিনি 'কীর্তিবিলাস' নাটকটি রচনা করেন। এর রচনাকাল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। এই নাটকের কথাবস্তু মৌলিক নয়, তবু বলতে হয় 'কীর্তিবিলাস'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্তক নাটক। নাট্যকার জি. সি. গুপ্ত বহু পাশ্চাত্য নাটক পাঠ করে দেশীয় রীতির (Convention) বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি এই নাটক রচনা করেন। এর কাহিনি সংগ্রহ করা হয় বাংলার সুপরিচিত রূপকথা 'বিজয়-বসন্ত' বা 'শীত-বসন্তে'র আখ্যান থেকে। নাট্যকার

জি. সি. গুপ্ত নাটকীয়তা, যথার্থ গদ্যে নাটকীয় সংলাপ বা যথার্থ চরিত্র সৃষ্টি— কোনো দিকেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি, তবু তাঁর নাট্যবস্তু উপস্থাপনার অভিনবত্বের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার জি. সি. গুপ্ত এই দেশের মানুষের রস-সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বিয়োগান্তক নাটক, রচনার ব্যাপারে একটু রক্ষণাত্মক ছিলেন। তিনি বিয়োগান্তক নাটকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ ভূমিকা অবতারণা করেন পাছে কেউ এই কাজকে দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কাজ বলে সমালোচনা না করেন। এই ভূমিকাটিতে বাংলা ভাষায় বিয়োগান্তক নাট্যরচনায় তাঁর আগ্রহটিই ধরা পড়েছে। 'কীর্তিবিলাস' বিয়োগান্তক হলেও সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও সূত্রধার এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্য ও পদ্য উভয় এবং একটি সংগীতও এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। নাট্যকার আবার ইংরেজি (Scene) কথাটিকে 'অভিনয়' বলে অনুবাদ করেছেন। সবমিলে দেখা যাচ্ছে নাটকটি ইংরেজি নাট্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত হলেও, দেশীয় রীতি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি নাট্যকার জি. সি. গুপ্ত।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ঃ

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগনা (অধুনা দক্ষিণ) জেলার দক্ষিণাংশে হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামধন শিরোমণি। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারান। তাঁর দাদা-বৌদির কাছে তিনি পুত্র স্নেহে বড়ো হন। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হয়ে মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। মেট্রোপলিটন কলেজে কিছুদিন কাজ করার পর রামনারায়ণ কলকাতার গর্ভনমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

রামনারায়ণের রচনাবলির মুখ্য বিষয় হচ্ছে নাটক ও প্রহসন; নাট্যরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে তাঁকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলা হত। তাঁকে 'কাব্যোপাধ্যায়', 'কবিকেশরী' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি দুবার সমাজ-সমস্যামূলক প্রবন্ধ ও নাটক রচনার প্রতিযোগিতায় পঞ্চাশ টাকা করে পুরস্কার লাভ করেন। প্রথম প্রবন্ধখানির নাম 'পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক (১৮৫৪)। এ ছাড়া ও তিনি 'বেণীসংহার' নাটক (১৮৫৬); 'রত্নাবলী' নাটক (১৮৫৮); 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসন (১৮৬৫); 'নবনাটক' (১৮৬৬); 'উভয়সঙ্কট' (১৮৬৯); 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দখানি নাটক-প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। উল্লেখযোগ্য যে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মধুসূদনের মধ্যে নাটক রচনার সংকল্প জাগে।

নবনাটক ঃ

'নবনাটক' (১৮৬৬) রামনারায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে বহুবিবাহের কুফল এবং লোকশিক্ষার অনুকূলে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র

পক্ষে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক লেখার ভার দেওয়া হয়। এরপরই তিনি 'নবনাটক' রচনা করে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুশো টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

'নবনাটক' তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর পূর্বনাম ছিল 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নবনাটক', নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু বোঝা যায়। যদিও সেই সময় নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নাট্যরীতি ব্যবহার শুরু হয়েছিল, তবু তর্করত্ন মহাশয় সে দিকে না গিয়ে তাঁর নিজস্ব পরিচিত ও সিদ্ধ পথকে অনুসরণ করেই চলেছিলেন; নান্দী-প্রস্তাবনা হল তাঁর প্রমাণ। অবশ্য কালের প্রভাব এড়াতে পারেননি তিনি। যেমন— তিনি ইংরেজি নাটকের অনুসরণে অঙ্কের অন্তর্গত গর্ভাঙ্ক বা 'সিন' ব্যবহার করেছেন; বিয়োগান্তক রূপে নাটকটি রচনা করতে দ্বিধা করেননি; পাত্র পাত্রীর মুখে পদ্য ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও দেখা যায় এই নাটকে ভাষা ব্যবহার বা কৌতুকরস পরিবেশনের সময় রুচির মুখ রক্ষা করেছেন এবং এই নাটকের ভাষায় সারল্য এবং জীবন-নৈকট্য বিশেষ লক্ষনীয়। নাটকটি জোড়াসাঁকো থিয়েটারে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়।

কুলীনকুলসর্বস্ব ঃ

এই নাটকের রচনাকাল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ। এই নাটককেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সে সময়ে এক বড়ো সামাজিক সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা। বাঙালি সমাজে এই কৌলীন্য প্রথার মতো একটি কদাচারের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিরোধী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলস্বরূপ রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে মনোহর নাটক লেখার আহ্বান জানান। এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট রামনারায়ণ তর্করত্ন এই নাটকটি রচনা করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন।

কুলীন ব্রাহ্মণ কেশব চক্রবর্তীর ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮ বৎসর বয়স্ক চার মেয়ের সঙ্গে ঘটকের কারসাজিতে, কদাকার, মূর্খ, কানা, ও বধির এক কুলীনের বিবাহ দিয়ে কীভাবে উক্ত চক্রবর্তী তাঁর কুল রাখতে পেরেছিলেন তার করুণ কাহিনি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। নাটকটিতে নানা নাটকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার সার্থক হননি। এ নাটক বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরসে পূর্ণ হলেও নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে ব্যর্থ। এই নাটকের কাহিনি দৃঢ়-পিনদ্ধ নয়, কতগুলি আলগা ঘটনাচিত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে এই নাটক। তবে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই নাটকে নাট্যকার যে জীবনবোধের ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁর সহৃদয়তা ও মানবিকতার শক্তিতেই তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও কুলীন হয়েও নিজের সমাজের ত্রুটিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) ঃ

ক্ষীরোদপ্রসাদ চল্লিশটিরও বেশি ছোটো বড়ো নাটক রচনা করেছিলেন। সমকালীন

রঙ্গমঞ্চের চাহিদা তিনি অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়ের প্রভাবই তাঁর ওপর ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তবে গিরিশচন্দ্রের মতো ভক্তির আবেগ তাঁর ছিল না, আবার দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কবিত্ব শক্তিরও অভাব ছিল তাঁর। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনচেতনা ছিল অগভীর, নাট্যকলা বিষয়েও কোনো তীক্ষ্ণ বোধ ছিল না, তথাপি পরিমিত শক্তি নিয়ে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখিত নাট্যসম্ভারে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক অনেকগুলি থাকলেও সামাজিক নাটক বা প্রহসন একটিও নেই। তিনি অনেকগুলো রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য রচনা করেছিলেন। আসলে বর্তমানের তুলনায় ঐতিহাসিক রোমান্সের জগতে অথবা রঙ্গনাট্যের ও কাল্পনিক গীতিনাট্যের জগতে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

তাঁর আলিবাবা, জুলিয়া, কিন্নরী প্রভৃতি নাটকগুলো রঙ্গনাট্য-গীতিনাট্য জাতীয় রচনা। এগুলো গীতিবহুল ও হাল্কাসুরে রচিত। তরল ও খেয়ালি কল্পনাবিলাসের লঘু আস্বাদ এগুলোতে বর্তমান। আলিবাবা এই শ্রেণির রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নৃত্যগীত সহযোগে রচিত এই নাটকটি কৌতুকরসকে অবলম্বন করায় বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সাবিত্রী, মন্দাকিনী, ভীষ্ম, নরনারায়ণ প্রভৃতি তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটকগুলো একান্তভাবেই বিশেষত্বহীন। নাট্যগুণে ভীষ্ম এবং নরনারায়ণ নাটক দুটিই সর্বাধিক উজ্জ্বল। এই দুটি নাটকই বিশ শতকে রচিত। ভীষ্ম নাটকটি পৌরাণিক নাটক হলেও এর মধ্যে অনেকাংশে ভক্তিরসই প্রধান হয়ে উঠেছে। নরনারায়ণে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদের' প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, রয়েছে 'গান্ধারীর আবেদনে'র পরোক্ষ প্রভাবও। কর্ণের দৈব-লাঞ্ছিত পৌরুষের চিত্র অঙ্কন অপেক্ষা কৃষ্ণ নররূপী নারায়ণ কিনা এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞাসায় তিনি অধিক ব্যাকুল হয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, পদ্মিনী, চাঁদবিবি, আলমগীর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস অনুসরণের তুলনায় অতিনাটকীয় ঘটনাবিস্তার, অস্পষ্ট স্বাদেশিকতা ইত্যাদি এই জাতীয় রচনায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই নাটকগুলোর মধ্যে প্রতাপাদিত্য এবং আলমগীর কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের কিছুটা প্রভাব আলমগীর নাটকে রয়েছে।

অশ্রুমতী ঃ

অশ্রুমতী (১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, তাঁর সাহিত্যকর্মের নিত্যসঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকটি রানা প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এতে স্বদেশপ্রেমের পটভূমিকায় একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীকে মুসলমান কর্তৃক অপহরণ এবং মুসলমানের সঙ্গে বিবাহের ষড়যন্ত্র এই নাটকের প্রধান আখ্যান। মোগলসম্রাট সেলিম, প্রতাপসিংহের শত্রু মানসিংহ, ভ্রাতা শক্তসিংহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম এবং প্রণয়-সংঘাত বেশ তীব্র, ঘনপিনদ্ধ ও জটিল আকার ধারণ করেছে এই নাটকে। সেলি-অশ্রুমতীর প্রণয় কল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানবিক উদারতার পরিচায়ক। ধর্মীয়

তথা জাতীয় চেতনার বাধা নাট্যকার এখানে অতিক্রম করেছিলেন। প্রতাপসিংহের চরিত্রে কঠিন স্বাজাত্যাভিমান ও রূঢ় রক্ষণশীলতার মিশ্রণ ঘটেছে। এই নাটকের চরিত্র ভাবনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে স্পর্শ করেছেন। নাটকের শেষ দৃশ্য যদিও মেলোড্রামায় পরিপূর্ণ, তবু এর আভ্যন্তরীণ ট্র্যাজিক সুরটি যথেষ্ট আন্তরিক।

৩.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা শেষ করেছি। এবার আমাদের সামগ্রিক বক্তব্যের দিকে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক।

আমরা দেখলাম যে, মধুসূদনের হাতেই বাংলা নাটকের প্রথম শিল্প-সম্ভাবনা সূচিত হল। তাঁর প্রথম নাটকে সংস্কৃত রীতিরই অনুবর্তন, তবে কৃষ্ণকুমারী এবং প্রহসনদ্বয়ে তিনি ইংরেজি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐতিহাসিক রসসৃজনে, নারীচরিত্র অঙ্কনে, ট্র্যাজেডির বিচারে কৃষ্ণকুমারী উন্নততর।

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসংলাপে সংস্কৃতানুগত্য বর্তমান। নীলদর্পণ নাটকটি বাংলার সমাজ-ইতিহাসে গুরুতর প্রভাত বিস্তার করেছিল। ব্যঙ্গনাট্য রচনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ভগ্ন, বক্র স্বাভাবিক মানুষের চরিত্রাঙ্কনে তার সাফল্য অধিক।

পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাঁর নাটকগুলির বহিরঙ্গে ইংরেজি রীতির অনুসরণ থাকলেও মূলত এগুলি যাত্রাধর্মী ভক্তিরসই প্রচার করেছে। প্রহসনের ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে জীবনচিত্রগুলি কদাচিৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ নানা ধরনের নাটক রচনা করেছেন। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে তিনি নতুন আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কৌতুকনাট্যগুলিতে রুচিশীলতার পরিচয় প্রস্ফুট। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় সংকেতনাট্যের অনুরূপ বাংলা নাটক রচনা করলেন। সমাজ-সমস্যা, প্রকৃতি-রসসম্ভোগ অথবা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকগুলি গতানুগতিক, যদিও প্রহসনের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্টতার দাবিদার, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি উচ্চকণ্ঠে স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন। তাঁর নাট্যরীতি পাশ্চাত্যধর্মী। তবে তাঁর কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অনেক নাটকের নাট্যরস বিঘ্নিত হয়েছে।

৩.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

টড : ১৮১২-২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজপুতানার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

গ্যারিক : ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা। করুণরসাত্মক নাটকের চরিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অধিক। Druny Lane থিয়েটারের তিনি মালিক ছিলেন। শেক্সপিয়রের নাটক অভিনয়ের জন্য তিনি খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আঙ্কল টমস্ কেবিন : মার্কিন উপন্যাস। মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বিচার স্টো এটি রচনা করেন। দাস প্রথার মন্দ দিকগুলো এতে ফুটে উঠেছে। আমেরিকায় দাস ব্যবসায় অবসানের ক্ষেত্রে উপন্যাসটির এক ইতিবাচক ভূমিকা ছিল।

৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'বাংলা নাটকের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকেই আধুনিক যুগ সূচিত হয়েছে।' এই সত্যটি বিচার করুন।

২। বাংলা নাটকের উৎপত্তি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তার বিকাশ কীরূপ হয়েছিল সে বিষয়ে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখুন।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা নাটকসমূহের রূপায়ণের ক্ষেত্রে যাত্রা, সংস্কৃত নাটক এবং ইংরেজি নাটকের প্রভাবের সম্মিলিত ভূমিকাটি কয়েকটি দৃষ্টান্তযোগে পরিস্ফুট করুন।

৪। বাংলা নাটকের সূচনা ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির বিবরণ দিন এবং সেই সঙ্গে মধুসূদন বা দীনবন্ধুর নাট্যকৃতি কী রকম দেখান।

৫। উনিশ শতকের বাংলা নাট্য আন্দোলন ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

৬। দীনবন্ধুর নাটকে প্রথম গণ-জাগরণ ও প্রতিবাদের সুর উনিশ শতকে পরবর্তীকালের নাটকে উপেক্ষিত হয়েছে। আলোচনা করুন।

৭। রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারা অনুসরণ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক ও উত্তরপর্বের নাটকগুলির পরিচয়সহ ভাব ও আঙ্গিকগত পার্থক্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৮। ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যরচনায় মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কৃতিত্ব আলোচনা করে বাংলায় এই শ্রেণির নাটকের উদ্ভবের কারণ নির্দেশ করুন।

৯। মধুসূদন দত্তের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নাট্য রচনার প্রয়াস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যসহ বিস্তৃত আলোচনা করুন।

১০। নবনাট্য আন্দোলনের কারণ ও তৎসঙ্গে বাংলা নাটকের চারিত্রিক পরিবর্তন আলোচনা করুন।

১১। দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা বিচার করে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১২। **টীকা লিখুন ঃ**

রামনারায়ণ তর্করত্ন, কীর্তিবিলাস, জামাই বারিক, গোড়ায় গলদ, নবীন তপস্বিনী, ডাকঘর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অশ্রুমতী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

৩.১১ প্রসঙ্গ পুস্তক (References and Suggested Readings)

বর্তমান পত্রের বিভাগ- ৪ দ্রষ্টব্য।

******

চতুর্থ বিভাগ

বাংলা নাটকের ইতিহাস— ১৯৭২ পর্যন্ত

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)
৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৪.২ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা নাট্যধারা
৪.৩ গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলন
৪.৪ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ
৪.৫ নবনাট্য আন্দোলন
৪.৫.১ বিজন ভট্টাচার্য
৪.৫.২ তুলসী লাহিড়ী
৪.৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের নাট্যসাহিত্য
৪.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা
৪.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৪.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৪.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৪.১১ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায়— অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয় যেহেতু ইংরেজ চরিত্রের অঙ্গীভূত, তাই কলকাতাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই তারা নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিল। ইংরেজের অনুকরণে দেশীয় ধনী মান্যগন্য ব্যক্তিগণ নাটকাভিনয়ের কথা চিন্তা করেন এবং তারপর থেকে কলকাতার বাঙালি সমাজে নাটকাভিনয়ের প্রথা শুরু হয়। ইংরেজ স্থাপিত রঙ্গালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করল, কিন্তু সাধারণ মানুষ এ থেকে রসগ্রহণ করতে পারল না। ইংরেজি নাটকের ভাষা তাদের রসসম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নাট্যশালা স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন, যার ফলে অল্পকালের মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হল। সেগুলির মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি অন্যতম। এই সমস্ত নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বাংলা নাটকের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আঙিনায় নাট্যকারগণ এসে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা নাট্য ধারায় দেখা গেল এক বিরাট বিবর্তন। এর মূলে রয়ে গেছে যুদ্ধ-মন্বন্তর-প্রকৃতিক বিপর্যয়-

দাঙ্গা-গণ আন্দোলন-দেশভাগ ইত্যাদি। তাই এই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যেও বিরাট বিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমকালীন যুগ-জীবনের বিপর্যয়ের ছবি ফুটে উঠেছে এই সময়ের নাট্যসাহিত্যে। এই সময় বাংলা গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যধারা নিরলস প্রচেষ্টায় এগিয়ে গেছে। আসুন, এবার আমরা রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্য ধারার আলোচনায় অগ্রসর হব।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

উনিশ শতকে শৌখিন নাট্যশালা এবং পরবর্তীকতালে পেশাদারি নাট্যশালার মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যধারা বেশ সাবলীল ভাবেই এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্র-সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলার সমাজ-জীবনে দেখা গেল এক বিরাট বিবর্তন। এর মূলে রয়ে গেছে যুদ্ধ-মন্বন্তর-প্রাকৃতিক বিপর্যয়-দাঙ্গা-গণ আন্দোলন-দেশভাগ ইত্যাদি। তাই রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যরচনার ধারায়ও বিশেষ বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই অধ্যায়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারাটিকে চিহ্নিত করব।

৪.২ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা নাট্যধারা

দাঙ্গা ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে বাংলা যে খণ্ডিত স্বাধীনতা পেল সেই বেদনার ছবি নাটকে উঠে এল, তুলে ধরলেন গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যকারেরা। স্বাধীনতার পূর্বের কয়েকটি বছর যুদ্ধের আতঙ্ক, ব্ল্যাক আউট, ৪৩-এর মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভারত ছাড়ো আন্দোলন— জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাংলা নাটক ও রঙ্গালয় সেভাবে সাড়া দেয়নি। মানবতার এই চরমতম লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের দিনে বাংলার নাট্যকারেরা গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক নাটক ও প্রহসনই লিখে গেছেন। দেশের এই দুর্দিনে এগিয়ে এসেছিল গণনাট্য সঙ্ঘ, রচনা ও অভিনীত হল যুগোপযোগী নাটক। স্বাধীনতা ও দাঙ্গার বেদনা নিয়ে এল দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি।

ক্রমে গণনাট্য সঙ্ঘে ভাঙন ধরে, একদল সঙ্ঘে থেকে প্রগতিশীল জীবনভাবনায় বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনায় নাটক রচনা ও অভিনয় করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দল ক্রমে 'নবনাট্য' থেকে 'গ্রুপ থিয়েটার'-এ রূপান্তরিত হয়ে সুস্থ ও সৎ জীবনভিত্তিক নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনা ও অভিনয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। এঁরা কখনও কখনও স্বাদ বদ্‌লাবার জন্য বাণিজ্যিক থিয়েটারে গিয়ে নাটক করার চেষ্টা করেছেন, ষাটের দশকে উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', সত্তরের দশকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীকার' এইরকম প্রয়াসে সাফল্য অর্জন করেছিল। তবে বাণিজ্যিক থিয়েটার সে অর্থে বিষয়, উপস্থাপনা, অভিনয়ে কোথাও গতানুগতিক অবস্থানেই রয়ে গেছে। গ্রুপ থিয়েটার জন্ম দিয়েছে উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী,

দেবশংকর হালদার, গৌতম হালদারদের। লেবেডফের 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' ধরলে ইতিহাসগত দিক দিয়ে বাংলা থিয়েটার দুশো বছর অতিক্রম করে গেছে। তবে বাংলা নাটক বিশেষ করে বাংলা মৌলিক নাটক নয়। এখনও গণনাট্য ধারা নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে চলেছে।

এতদসত্ত্বেও বাংলার নাট্যকারেরা যে নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার ও নাটকের ধারা অব্যাহত রেখেছেন— নানা সীমিত প্রয়াস ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সেই ধারাকে বর্তমান প্রজন্মের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৪.৩ গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলন

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা নাট্যচর্চা একটি বাঁক নিয়েছিল, যার প্রভাব মঞ্চেও পড়েছিল— এই বাঁকটিকে সম্ভব করেছিল গণনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি দেখে নেওয়া যাক। ১৯২৯-এর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্যাসিস্ত শক্তির উত্থান শুরু হয়। এরা গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। ইতালিতে মুসোলিনি, জার্মানিতে হিটলার, স্পেনে ফ্রাঙ্কো, জাপানে তেজোর উত্থান এরই দিক্‌নির্দেশ করে। ১৯৩৩-এর ১০ই মে বার্লিন স্কোয়ারে ফ্যাসিস্ত শক্তি বিখ্যাত মানবপ্রেমী গ্রন্থকারদের বই পুড়িয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে। এই ঘটনা গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষদের একত্রিত করে। ফ্যাসিবিরোধী কিছু সংগঠন তৈরি হয়। ভারতেও লক্ষ্ণৌতে মুন্সি প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৩৬-এর ১০ এপ্রিল। ক্রমে বোম্বাই, দিল্লি ও কলকাতায় তার শাখা খোলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করায় তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে (৮ মার্চ, ১৯৪২) তারা আবার প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম শুরু করে। ঐ দিনই ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী মিছিল পরিচালনার সময় প্রকাশ্যে পার্টিকর্মী সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট শক্তির চক্রান্তে নিহত হন। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ২৮ মার্চ কলকাতায় প্রগতিপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ'। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র বঙ্গীয় শাখা রূপান্তরিত হল এই নতুন নামে। ঐ বছরেই এই সঙ্ঘের শাখা হিসেবে বাংলায় গণনাট্য সঙ্ঘের সূচনা হলেও সর্বভারতীয় সংগঠনরূপে তখনো গণনাট্য সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ করেনি। ১৯৪৩-এ বিভিন্ন অঞ্চলের গণনাট্য শাখাগুলি মিলিতভাবে তৈরি করে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' (Indian People's Theatre Association সংক্ষেপে IPTA)।

গণনাট্য আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ছাত্র ও কিছু কমিউনিস্ট কর্মী। তাঁরা তাঁদের পক্ষে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে জোরদার করতে মন দিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। এঁদের গান-বাজনা-নাটক-আবৃত্তিতে জনসাধারণের প্রাণে জোয়ার আসে। এই Youth Cultural Institute (YCI)। তিনটি শাখায় কাজ করত— নাচগান, নাটক ও আলোচনা সভা প্রদর্শনী।

১৯৪০ সাল নাগাদ জলি কলের লেখা 'পোলিটিশিয়ানস টেক টু রোয়িং' নাটকের অভিনয় দিয়ে এঁদের নাট্যশাখার উদ্বোধন হয়। এর সঙ্গে 'দ্য বয় গ্রোজ আপ', 'শেপকীপারস ইন দ্য হার্ট অফ চায়না' প্রভৃতি নাটককে গণনাট্য আন্দোলনের উৎস হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এছাড়া সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল'-এর নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'কেরানী' অভিনীত হয়।

ভারতীয় গণনাট্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে ছাত্র ফেডারেশন, YCI প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি মিলিত হয়। 'গণনাট্য' বা 'পিপলস্ থিয়েটার' কথাটির উদ্ভাবক ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। এছাড়া আয়ার্ল্যান্ডের 'ডাবলিন' থিয়েটার, সোভিয়েতের 'পিপল্স থিয়েটার', চিনের 'রেড থিয়েটার'— এরাও এদেশের গণনাট্যকে প্রভাবিত করে। গণনাট্য অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক— আনন্দ বিধানের মধ্য দিয়ে নাটককে মুষ্টিমেয় বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের সামগ্রী করে তোলা ও একইসঙ্গে সর্বসাধারণকে সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন করে তোলা। গণনাট্য আন্দোলন কোনভাবেই তাই রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন নয়— এই আন্দোলন অবশ্যই একটি বিশেষ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের নাট্যপ্রয়াস। এই পথেই আধুনিক থিয়েটারের পিপলস্ থিয়েটারের পথে যাত্রা— যে থিয়েটার মুক্তিকামী মানুষের কাছে পালাবদলের হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য হবে।

গণনাট্য উদ্ভব ও বিকাশের প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। এরপর একে একে অনেকগুলি গোষ্ঠী গণনাটক নিয়ে এগিয়ে আসে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী জীবন-চিত্র তুলে ধরতে— 'উত্তর সারথী', 'অনুশীলন', 'L.T.G', 'থিয়েটার-সেণ্টার' প্রভৃতি। পাশাপাশি গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাবে ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চগুলিতেও ছোঁয়া লাগে পরিবর্তনের।

৪.৪ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। এসময় হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি ইতালি ও স্পেন ছাড়া সমস্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরাধীন ভারতবর্ষ পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত সারা ভারতের সঙ্গে বঙ্গদেশও চরম দুর্গতিতে পড়ে। সার্বিক দুর্গতির অনুষঙ্গ হিসাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও এক বিপরীত ভাব লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ চলাকালীন চরম সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা নাটকসহ নাট্যমঞ্চ আকাঙ্ক্ষিত স্থাণুত্বকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাটক ও নাট্যশালা ১৯৩৯-৪৫ এর মাঝে দাঁড়িয়ে গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং উচ্চবিত্তের জীবনের গলিত নীতি, ধর্ম ও দেশাভিমানের তরল আবেগসর্বস্বতা সম্বল করে কোনাক্রমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

অন্যদিকে এই বিপর্যয়ের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হয়। সাম্যবাদে অনুপ্রাণিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হল। ফলে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি

সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের নিয়ে তৈরি হল YCI বা Youth Cultural Institute, স্থান ছিল কলকাতার মিশন রো এক্সটেনশনের 'কেন্ট হাউস'। বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্কের পাশাপাশি ছিল নাচগান, পোস্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। পরে এখানে নিজের রচিত গান ও নাটকও অভিনয় হতে থাকে। বলা যায় এ থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উৎপত্তি। এই সময়ই অর্থাৎ ১৯৪২ এর ৮ মার্চ তরুণ প্রগতিবাদী লেখক ঢাকার রাস্তায় প্রকাশ্যে দিনের বেলা খুন হলেন, এঁর নাম ছিল সোমেন চন্দ। এই খুনের প্রতিক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ২৮ মার্চ তারিখে কোলকাতায় 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগের বৎসর অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' এবং পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৪৩) 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' বা Indian People's Theatre Association, সংক্ষেপে I.P.T.A. এর উদ্দেশ্য ছিল নাট্য-আন্দোলনকে গণমুখী এবং সমাজ-পরিবর্তনের সপক্ষে গণ আন্দোলনের অঙ্গীভূত করে তোলা। এটি গড়ে উঠেছিল মূলত বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রঁমা রোঁলার The People's Theatre তথা চীন ও স্পেনের People's Theatre-এর নাট্যান্দোলনের আদর্শে। এই সংঘের মুখ্য বাণী ছিল 'People's Theatre Stars the People', অর্থাৎ 'জনগণই গণনাট্যের নায়ক'। এই সংঘের প্রতীকটি এঁকে দেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টচার্য।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়নি, তখন 'গণনাট্য সংঘে'র বাংলা শাখা কাজ আরম্ভ করে। দেশে মহামন্বন্তর দেখা দিয়েছে, চারদিকে শ্রমিক ধর্মঘট, নৌবিদ্রোহ, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিদাবির আন্দোলন চলছিল— এই সময় পরিবেশ অনুযায়ী ছোটো ছোটো নাটক ও গণসংগীতের সাহায্যে আন্দোলনকে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। বিনয় রায়ের 'ম্যয় ভুখা হুঁ', বিজন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি'— এসব নাটক লেখা ও অভিনয়ের ফলে IPTA বা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' মানুষের মধ্যে পরিচিত হতে শুরু করল।

এই সংঘের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গণনাট্য কোনো বিশেষ শিল্পীর সর্বাত্মক একক প্রাধান্যকে স্বীকার করে না। এ হল যৌথ প্রযোজনা। সাধারণ দর্শকের জন্য যেমন শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নাটক রচিত হতে লাগল। এই সংঘ নাটক-মহিমাকে অস্বীকার করল। এতে স্থান রইল গনসংগীতের, মঞ্চসজ্জার কোনো স্থান রইল না, পেছনের দর্শক যাতে দেখতে পায় তার জন্য অভিনয় স্থানটি একটু উঁচু হলেই চলবে। পোষাক পরিচ্ছদেরও তেমন বালাই ছিল না। উল্লেখ্য এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ে এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরকে সামনে রেখে ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গমে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা এবং বিজনবাবু ও শম্ভুমিত্রের যৌথ পরিচালনায় 'নবান্ন'র ঐতিহাসিক মঞ্চায়ন এই সংঘের একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এরপর থেকে প্রায় স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত (১৯৪৭) গণনাট্য সংঘ তাঁর পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রেখে বাংলা নাট্যমঞ্চের সেবা করে গেছে।

৪.৫ নবনাট্য আন্দোলন

গণনাট্য সঙ্ঘ বাংলা রঙ্গমঞ্চে নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ। অন্যান্য সব আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ও ছিল চাঞ্চল্যের, উত্তেজনার, উদ্দীপনার। পেশাদারি মঞ্চের একাধিপত্য চূর্ণ করে সাধারণ মানুষের জীবনকে নাট্যের

কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে, শাসক ও পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে এই উত্তেজনা প্রথম গণনাট্য সঙ্ঘই প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তীকালে নবনাট্যের অভিনয় নতুন নতুন নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে সমাজের সবশ্রেণিকেই রুচি বলদের গান শোনালো। এরাই 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে পরিচিত। গণনাট্য সঙ্ঘ যখন ক্রমশ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রচারকেই সারবস্তু মনে করল তখন নবনাট্য আন্দোলনের শরিকরা তা মেনে নিতে পারলেন না। ফলে গণনাট্য সঙ্ঘের বেশকিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সাধারণ নাট্যপ্রেমী এখান থেকে সরে এসে নতুন নতুন নাট্য-আঙ্গিক, প্রযোজনায় নিত্য নতুন উদ্ভাবন, মঞ্চসজ্জায় অভিনবত্ব, জীবনের আচার-আচরণের সঙ্গে অভিনয়কে একাত্ম করে নেওয়া, আবহ সঙ্গীত ও আলোর প্রতীকী প্রয়োগ ইত্যাদিতে মনোযোগী হলেন। তাছাড়া ১৯৪৬-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে গণনাট্য সঙ্ঘের কাজকর্মও সংকুচিত হয়— এসব কারণই গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম হয়। শম্ভু মিত্র ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠা করলেন 'বহুরূপী'। তাঁদের প্রথম প্রচারপত্রে বলা হয়, 'আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে-নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রকাশ আছে।' এর কিছুকাল পরে বিজন ভট্টাচার্য এবং আরও কোন কোন নাট্যব্যক্তিত্ব এবং শিল্পী নতুন নতুন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুললেন।

বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্যকর্মী, একদা গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্য শ্রীগঙ্গাপদ বসু-র কথায়, 'সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, একেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক। এবং এইরকম নাটক দিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর সত্য ও রিয়ালিটির যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নবনাট্য আন্দোলন।' 'বহুরূপী' এই আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, শম্ভু মিত্র তার কান্ডারী। এর পরই নবনাট্য আন্দোলনে জোয়ার আনলেন বিজন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'নাট্যচক্র' ও 'ক্যালকাটা থিয়েটার', উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', 'শৌভনিক', 'গন্ধর্ব', 'থিয়েটার ইউনিট', 'নান্দীকার', 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' প্রভৃতি। এঁরা সবাই এক অর্থে গণনাট্য ধারারই সম্প্রসারিত রূপ। এই একই সময়ে কোনো কোনো নাট্যগোষ্ঠী একেবারেই গণনাট্যধারার বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সৎ নাট্য প্রযোজনার চেষ্টায় গড়ে তোলেন 'সুন্দরম' 'লোকমঞ্চ', 'রঙ্গশ্রী' প্রভৃতি গোষ্ঠী। নবনাট্য আন্দোলন সেইসময় পৃথিবীজুড়ে চলা নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারাও আকৃষ্ট হয়— ব্রেখটের এপিক থিয়েটার, স্তানিসলোভাস্কির মঞ্চে অভিনয়ে যুগান্তর আনার চেষ্টা, পীরেনদেল্লোর নতুন নতুন নাটকের অভিঘাত তাঁদের বিদেশি নাটক অনুবাদেও উৎসাহ জোগায়। তবে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে যে সমবেত প্রচেষ্টার নাম ছিল নবনাট্য আন্দোলন তা যতখানি আশা, উৎসাহ ও স্বপ্ন দেখিয়েছিল ততখানি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে বিরত থাকে।

৪.৫.১ বিজন ভট্টাচার্য

গণনাট্য উদ্ভব ও বিকাশের প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৪৩-এ তাঁর দুটি নাটক প্রকাশিত হয়— 'আগুন' ও 'জবানবন্দী'। এখানে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সচেতনতা এবং রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার অল্প বিস্তর প্রকাশ থাকলেও

বিপ্লবের উচ্চকণ্ঠ বা বাঁচার স্বপ্নকে ইতিবাচক পরিণতি দেওয়ার চেষ্টা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এরপরেই প্রকাশিত হয় 'নবান্ন' (১৯৪৪)। এই তিনটি নাটকই দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও শোষণ ও প্রতিরোধের সম্পূর্ণ চিত্র 'নবান্ন'-তেই বলিষ্ঠভাবে পাওয়া যায়। আর সেই অর্থেই 'নবান্ন'-র অভিনয় প্রথম গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। গতানুগতিক নাট্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়, মঞ্চ ব্যবস্থা, সঙ্গীত, আলোকসম্পাত একে অভিনব করে তোলে, দাঙ্গা দেশভাগের বেদনা ধরা পড়েছে তাঁর 'গোত্রান্তর' নাটকে। সমসাময়িক জীবনভাবনা, মানুষের যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষ-আকাল, শাসন-শোষণ-পীড়ন এইসব নাটকে প্রকাশ পেল। প্রধান চরিত্র হল সাধারণ মানুষ, মেহনতি কৃষক-শ্রমিক আর সঙ্ঘবদ্ধ জনতা পেল নায়কের মর্যাদা। গোটা আমিনপুর গ্রামের কৃষকসমাজের জীবনযন্ত্রণার দলিল হয়ে উঠল 'নবান্ন'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক— 'মরাচাঁদ', 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী', 'জননী' প্রভৃতি।

৪.৫.২ তুলসী লাহিড়ী

গণনাট্যের প্রথম পর্বের আর এক নাট্যব্যক্তিত্ব তুলসীদাস লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক— 'মায়ের দাবী' (১৯৪১), 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০), 'পথিক' (১৯৫১)। 'দুঃখীর ইমান' এবং 'ছেঁড়া তার' বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। নাট্যকার হিসেবে তিনি গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষ থেকে শুরু করে আদিবাসী মানুষের কথা তুলে ধরেছিলেন। কয়লাখনির শ্রমিকদের দুঃখময় জীবনের বর্ণনাও উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। তাঁর 'মায়ের দাবী' মঞ্চস্থ করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী মঞ্চস্থ করেছেন 'দুঃখীর ইমান'। 'বহুরূপী'-র প্রয়োজনীয় মঞ্চস্থ হয় 'পথিক'। শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'ছেঁড়া তার'। তুলসী লাহিড়ী নাটক রচনা ছাড়া নিজেও মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তাঁর 'পথিক' নাটকের সিনেমার চিত্রনাট্যও প্রস্তুত করেছেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর দ্রুত বদলে যাওয়া থিয়েটারের সঙ্গে অনেকের সঙ্গে তুলসী লাহিড়ীরও নিজেকে বদলে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৪.৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের নাট্যসাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার বলতে ব্যবসায়িক রঙ্গালয়ের নাট্যসৃষ্টিকেই বোঝাত— এটিই ছিল মূল স্রোত। এই ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্য দিয়ে দিক পরিবর্তন অসম্ভব ছিল, প্রয়োজন ছিল অন্য থিয়েটারের। ১৯৪৩-এ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সেদিক দিয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী— এদের নাটক দেশবাসীকে দাঁড় করাল নির্মম নিষ্ঠুর হতশ্রী বাস্তবের মুখোমুখি। তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল থিয়েটার আর পেশায় নয়, থিয়েটার সামাজিক দায়বদ্ধতায়। এদের নাটক নতুন বাংলা থিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল, তবে বছর দশেকের বেশি গণনাট্য সঙ্ঘের ঝড়টা স্থায়ী হয়নি। অনেকেই গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে এসে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী (গ্রুপ থিয়েটার) তৈরি করলেন। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত উল্লেখ্য। 'ভালো নাটক ভালোভাবে করব' এই সৃজনসাধ থেকে গড়ে ওঠা অসংখ্য নাটকের দলে স্বল্পদৈর্ঘ্যের একাঙ্ক নাটক রচনার ঢেউ ওঠে। ফলে বাংলা নাট্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পঞ্চাশের দশক জুড়ে বাংলা

থিয়েটারে নাটকের জোয়ার, সঙ্গী নবনাট্য আন্দোলন। স্বাধীনতা যতই বিপর্যয় ডেকে আনুক বাঙালির জীবনে তার সৃজনশীলতা কিন্তু বন্ধ হয়নি।

ষাটের দশকের শুরুতেই এল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীকার'। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— এই ত্রয়ীর সৃজনসম্ভারে স্বাধীনতার পরের পঁচিশ বছরে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা নাট্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়। 'বহুরূপী'র চার অধ্যায়, দশচক্র, রক্তকরবী, ডাকঘর, পুতুলখেলা, রাজা অয়দিপাউস, রাজা; উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ ও পি. এল. টি.-র নিচের মহল, অঙ্গার, কল্লোল, মানুষের অধিকারে, তিতাস একটি নদীর নাম, টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড, 'নান্দীকার'-এর মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, যখন একা, শের আফগান, তিন পয়সার পালা— এইসব নাটকের সঙ্গে যদি ধরা হয় ক্যালকাটা থিয়েটার, রূপকার, অনুশীলন সম্প্রদায়, মুখোশ, শৌভনিক, চতুর্মুখ, গন্ধর্ব, সুন্দরম, নক্ষত্র, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, গান্ধার, চেতনা, সয়িক এবং আরও অনেক দলের নাট্যকৃতি তাহলে এইসময়ের নাট্যোৎকর্ষের পরিমাপ এই আলোচনায় কুলোবে না।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাংলা থিয়েটারে অনেক বৈচিত্র্যও দেখা গিয়েছে। শ্যামল ঘোষ ও তরুণ রায় এই ব্যতিক্রমী কাজের উদগাতা, শ্যামল ঘোষ মঞ্চে কাব্যনাটক করিয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, দিলীপ রায় প্রমুখ উৎকৃষ্ট কিছু কাব্যনাটক লিখেছিলেন। এখন সাহিত্যিকদের সঙ্গে মঞ্চের একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল। তরুণ রায় ছাড়া এখন আর কেউ রহস্য নাটক লেখা বা প্রযোজনার কথা ভাবেননি, সাহস করে এগিয়েও আসেননি। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এসেছিলেন বাদল সরকার আর ষাটের দশকের গোড়ায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এই দুজনকে না পেলে বাংলা নবনাট্যের মান রক্ষাই হত না। 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'পাগলা ঘোড়া',— বাংলা থিয়েটারে নাটক লেখার মোড় ঘুরিয়েছে। বল্লভপুরের রূপকথা, রাম শ্যাম যদু, কবিকাহিনী-র মতো অভিজাত বুদ্ধিশীল কৌতুক নাটক বাদল সরকারের আগে কেউ লেখেননি, তিনি অবশ্য দীর্ঘদিন মঞ্চের জন্যনাটক লিখলেন না, থার্ড থিয়েটারের জন্য লিখলেন— 'মিছিল', 'ভোমা', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'হট্টমালার দেশে' প্রভৃতি নাটক। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের পুরোধা এই ব্যক্তিত্ব। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের নাটকগুলি এতই আলাদা যে তাদের কোন্ গোত্রে রাখা যাবে বুঝতে না পেরে— 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড',"ক্যাপ্টেন হুররা'— এগুলির নাম শ্যামল ঘোষ রেখেছিলেন কিমিতিবাদী। এঁদের দুজনের পাশাপাশি আরো কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক তৈরি হয়েছে ওই সময়।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি 'দানসাগর' আর 'অমিত্রাক্ষর' লিখে হৈচৈ ফেলে দেন দেবাশিষ মজুমদার। সেই থেকে ক্রমাগত তিনি ধ্বস্ত, দেশ ও কালের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে হারিয়ে যাওয়া ধনরত্নের সন্ধান করেন, জীবনের সারসত্য আবিষ্কারে মেতে থাকেন। বলতে হয় চন্দন সেনের কথা। তিনি আগাগোড়া জীবন-ঘনিষ্ঠ, জীবন-দরদী ও জীবনরসিক নাট্যকার। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী ইন্দ্রাশিস লাহিড়ি, সৌমিত্র বসু, শেখর সমাদ্দার, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। ভালো নাটকের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে নাট্য প্রশিক্ষণের বিষয়টিও।

৪.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা (Summing Up)

মন্মথ রায় / কারাগার ঃ

ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অনেকগুলি একাঙ্ক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করে মন্মথ রায় বাঙলা সাহিত্যের ইতহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। আধুনিক কালের ভাব ও ভাষায় পুরাণের কাহিনিকে নাট্যরূপ দান করাই হচ্ছে মন্মথ রায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা 'কারাগার' (১৯৩০) এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে তিনি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন পথের পথিক। নাট্যকার মন্মথ রায়ের কারাগার নাটকটি নানা কারণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। এই নাটকটি রূপকধর্মী। মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' নাটকে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রেখে, সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন জাতির মুক্তির আবেগও নাটকে সঞ্চারিত করেছেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত' -এর কাহিনি নিয়ে এই নাটকটি সাজানো হয়েছে। কংসের অত্যাচারে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। যাদবকুল যখন ছটফট করছিল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন এবং কংসকে বধ করেন। ইংরেজ শাসিত গোটা ভারতবর্ষই তো একটা কারাগার, আর এই ভারতরূপ কারাগারে শৃঙ্খলিত হয়ে আছেন বাসুদেব, দেবকী, কঙ্কা, কঙ্কনা প্রমুখ। অন্যদিকে কংস বৃটিশ রাজশক্তির প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

পৌরাণিক নাটকের ছদ্মবেশ ধারণ করা এই দেশাত্মবোধক নাটকটির তাৎপর্য অনুধাবন করা ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাই ১৮টি অভিনয়ের পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ ফ্রেব্রুয়ারি তে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের Dramatic Performances Act অনুসারে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয়। কারণ বৃটিশদের মতে এই নাটক "Is likely to excite feelings of disaffections towards the Government established by law in British India." এই নাটক বন্ধ করার জন্য সেদিন বাংলা-ইংরেজি সংবাদপত্র তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বৃটিশ সরকার সে সব গ্রাহ্য করেনি। অবশ্য এই ঘটনার প্রায় আট মাস পরে ৮ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'নাট্যনিকেতনে' নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়। উল্লেখ্য, সরকারের পক্ষে আপত্তিকর দৃশ্যগুলি বাদ দিয়ে পুনরায় অভিনয় করা হয় কারাগার। এসব কারণেই 'কারাগার' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

'কারাগারে'র বাইরেও তিনি আরও কিছু নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ সদাগর'; 'দেবাসুর'; 'শ্রীবৎস'; 'সতী'; 'খনা'; 'বিদ্যুৎপর্ণা'; 'রাজনটী'; 'অশোক' প্রভৃতি উল্লেখের দাবিদার। তাঁর সার্থক একাঙ্কের মধ্যে 'রাজপুরী' ও 'মুক্তির ডাক' উল্লেখযোগ্য। এই বিখ্যাত নাটকসমূহ রচনার জন্য মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ছেঁড়াতার ঃ

তুলশী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটক ১৯৫০/১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই

নাটকে নাট্যকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলায় যে আকাল দেখা দিয়েছিল তার জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং মৌলবাদীদের বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে এই নাটকে। নাট্যকার এখানে উত্তর বাংলার সৎ আদর্শনিষ্ঠ মুসলমান কৃষক সমাজের জীবনচিত্র অঙ্কিত করেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের বর্ণনা, কৃষক জীবনের চিত্র, মুসলমান সমাজের চিত্র, আঞ্চলিকতার প্রয়োগ, চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে লেখক এই নাটকে অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

'ছোঁড়াতার' নাটকে একদিকে যেমন রয়েছে বাস্তবতার নির্মম চিত্র, অন্যদিকে ঘটেছে মানব-হৃদয়ের গভীর উন্মোচন। নাটকের নায়ক রহিমুদ্দি ঈশ্বর বিশ্বাসী, সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট কৃত্রিম বিধান তার সর্বনাশের কারণ— ফুলজানের শেষ সংশয়মূলক প্রশ্নের মাধ্যমে তুলশী লাহিড়ী তা তুলে ধরেছেন। পরোক্ষভাবে নিয়তির ভূমিকা এই নাটকে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। কারণ রহিমুদ্দি একাধিকবার যে ভুল করেছে তা নিয়তি চালিত। রহিমুদ্দির শোচনীয় পরিণাম ও করুণ পরিণতি নাটকটিকে ট্র্যাজেডির পর্যায়ভুক্ত করেছে। রহিমের ট্র্যাজেডির জন্য মূলত তার অন্তঃসত্ত্বাই দায়ী। এই নাটকে ফুলজান সংস্কারাচ্ছন্ন নারী। রহিমের প্রতি তার প্রেম অগাদ। অন্যদিকে, বাংলার কুসিদজীবী, ভণ্ড, লোভী চরিত্র হ'ল এই নাটকের হাকিমুদ্দি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৩৫০ এর মন্বন্তয়ের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকের সংলাপ পুরোটাই উত্তরবঙ্গের উপভাষা।

নবান্ন ঃ

বিজন ভট্টাচার্যের কালজয়ী নাটক 'নবান্ন' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এই 'নবান্ন' নাটক। এটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত প্রথম নাটক। এই 'নবান্ন' নাটক থেকেই 'গণনাট্য আন্দোলনে'র সূত্রপাত। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বাশ্রয়ী এই নাটকটি যথার্থই গণনাট্যের পর্যায়ভুক্ত।

আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় 'নবান্ন' নাটকের কাহিনি রচিত হয়েছে। এর কাহিনি অংশে সমাজের একেবারে নিচের তলার মানুষ— কৃষক দুঃস্থদের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিজন ভট্টাচার্যের মন্তব্য - "ঘরে যেদিন অন্ন ছিল না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে।" কুড়ি শতকের চল্লিশের দশকের বিপর্যস্ত গ্রামীন অর্থনীতির পাশাপাশি কলকাতা শহরের বিপর্যস্ত অর্থনীতির চেহারাটি এই নাটকে খুব জীবন্তভাবেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচার এই নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার এবং তার পরিবারের কাহিনি 'নবান্ন' নাটকের মূল উপজিব্য বিষয়। আপাতভাবে প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের জীবন সমস্যা এই নাটকে অঙ্কিত হলেও আসলে এটি বাংলার গ্রাম-শহরের উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। এই নাটকে নাট্যকার প্রথাসিদ্ধ চরিত্রচিত্রণ থেকে সরে এসে গণমুখী চরিত্র চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে মেদিনীপুর,

আমিনপুর, সাতক্ষীরা, বসিরহাট, যশোহর, খুলনা— এইসব অঞ্চলের চাষিদের মুখের ভাষা। এই নাটকে নাট্যকার প্রথম লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পেশাদার অপেশাদার সব নাট্যমঞ্চে এই নাটক অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে।

দেবীগর্জন ঃ

বিজন ভট্টাচার্যের গণনাট্য পর্যায়ভুক্ত নাটক 'দেবী-গর্জন' ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কৃষক আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে নাট্যকার এই নাটকটি উৎসর্গিত করেছেন। এই নাটকের বর্ণিতব্য মূল বিষয় হ'ল— আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হওয়া, শত্রুকে পরাস্ত করা এবং জননীকে খুঁজে পাওয়ার আপ্রাণ-প্রচেষ্টা।

গণনাট্যের বৈশিষ্ট্য 'দেবীগর্জন' নাটকে সুস্পষ্ট। সুতরাং, শ্রেণিবৈষম্যমূলক গণনাট্যসুলভ ব্যাখ্যা এই নাটকে বর্তমান। এই নাটকে অত্যাচারী শ্রেণির প্রতিভূ-প্রভাঙ্গন-ত্রিভুনরা। অন্যদিকে অত্যাচারিত শ্রেণির মধ্যে রয়েছে— সর্দার-সঞ্চারি-মংলা-মনা-রত্না প্রমুখ। এরা মূলত শ্রেণিবৈষম্যের ফলে জাত। ফলে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বমূলক চিত্র এখানে অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গণনাট্যসুলভ গ্রামীন লোকায়ত আচার-আচরণ, সংস্কার ইত্যাদি এই নাটকে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া গণনাট্যের আঙ্গিক, গঠনরীতি ও প্লট নির্মাণের দিক থেকেও 'দেবীগর্জন' অন্যতম। তাই এই নাটকে তথাকথিত পাঁচ অঙ্কের বদলে তিন অঙ্কে কাহিনি-সমৃদ্ধ। আবার গণনাট্যের উপযোগী করেই নাট্যকার এই নাটকে বেশকিছু লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহার করেছেন এবং বাংলা লোকনাট্য, লোকগীতি ও লোকনৃত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছেন।

চল্লিশের দশকে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'কলঙ্ক' নাটকের অনেকটাই অনুসৃত হয়েছে 'দেবীগর্জন' নাটকে। 'দেবীগর্জন' নাটকের ঘটনাস্থল হ'ল স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবাংলার অজস্র গ্রামের সমতুল্য বীরভূমের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। এই নাটকের শেষে বিজন ভট্টাচার্য মাতৃকাশক্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অঙ্গার ঃ

উৎপল দত্ত রচিত বিখ্যাত নাটক 'অঙ্গার' ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কয়লাখনির মালিকদের লোভ-লালসা ও অত্যাচারের শিকার হয়ে শ্রমিকদের জীবনে কী ভয়নাক দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসতে পারে তা-ই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। রানীগঞ্জ, আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারীর ধূসর পৃথিবী 'অঙ্গার' নাটকের পটভূমি। চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুরিয়া কোলব্রুক কোলিয়ারীতে একের পর এক যে দুর্ঘটনা ঘটেছে— তারই প্রতিরূপ 'অঙ্গার' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে খনি অঞ্চলের 'শেলডন কোলিয়ারী'কে ঘিরে। আসানসোলের এক কোলিয়ারী মালিকদের অত্যাচার এই নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাট্যকার একটি মাত্র কোলিয়ারীর

মালিকদের লোভ-লালসা, শ্রমিকদের উপর তাদের অত্যাচারের কাহিনি 'অঙ্গার' নাটকে অঙ্কন করলেও এটি আসলে সমস্ত কোলিয়ারীর মালিকদের অত্যাচার লোভ-লালসার কাহিনি।

'অঙ্গার' নাটকে নাট্যকার সমকালীন জীবন থেকে তুলে আনা বাস্তব ঘটনাকে নাট্যিক উপকরণ হিসেবে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই এই নাটকে নাট্যকার যে চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন তারা সব বাস্তবজীবন থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষ। বিনু এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তার মা ও বোন সুমনা এবং প্রেমিকা রূপাকে ঘিরে তার আশা স্বপ্ন ও কল্পনা নাট্যকার এই নাটকে চিত্রিত করেছেন। নাট্যকার তাঁর অন্তরের কথা বিনুর মুখ দিয়ে এই ভাবে উচ্চারণ করিয়েছেন - "কয়লা যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ-থেকে, চেহারা হ'ল পোড়া কালো কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নিসম্ভাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ।" 'অঙ্গার' নামকরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বোঝতে চেয়েছেন যে— এই নাটকের সফল চরিত্রগুলিই যেন জীবনের সংগ্রামী উত্তাপে দগ্ধ হওয়া অঙ্গার। তাদের নিয়তিই যেন জ্বলে ওঠা। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে ওঠে ওরা ছাই হয়ে যায়, তাই এখানে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের বহ্নি-শিখা।

৪.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারে উপনীত হয়ে আমরা দেখলাম রবীন্দ্র-পরবর্তী নাট্যধারার এক বিরাট পরিবর্তন। দেশের দুর্দিনে সৃষ্টি হ'ল গণনাট্য সংঘ, রচিত ও অভিনীত হল যুগোপযোগী নাটক। এক সময় গণনাট্যের ভাঙন ধরে সৃষ্টি হল নবনাট্য আন্দোলন। দেখা গেল রাজনীতি চেতনাই এই নবনাট্যদলের উদ্দেশ্য, বামপন্থীচেতনা ছিল মুখ্য।

গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য পথিক বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সমসাময়িক জীবন ভাবনা, মানুষের যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষ-আকাল, শাসন-শোষণ-পীড়ন ইত্যাদি প্রকাশ পেল। অন্যদিকে গণনাট্যের প্রথম পর্বের আর একজন ব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ীর নাটকে দেখা গেল বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তরের ছবি, কয়লাখনি মানুষদের দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই দশকের বাংলা নাট্যধারার দেখা গেল আমূল পরিবর্তন। এই যুগে নাট্য প্রতিক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

৪.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা নাট্যধারার সবিশেষ পরিচয় দিন।

২। গণনাট্য আন্দোলনের একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিন।

৩। কীভাবে নবনাট্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপন করুন।

৪। গণনাট্য ও নবনাট্যের মঞ্চ পরিকল্পনার গুরুত্ব কোথায়? সবিশেষ আলোচনা করুন।

৫। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকৃতির পরিচয় দিন।

৬। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তুলসী লাহিড়ী কেন বিখ্যাত? তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা সম্পর্কে এক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৯। টীকা লিখুন ঃ মন্মথ রায়, নবান্ন, ছেঁড়াতার, দেবীগর্জন, অঙ্গার।

৪.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References and Suggested Readings)

১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ক্ষেত্র গুপ্ত।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ-৮ম খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৫। বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (২য় খণ্ড)— গোপাল হালদার।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য— সুকুমার সেন।

৮। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (২য় খণ্ড)— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। বাংলার রেনেসাঁস— অন্নদাশঙ্কর রায়।

১০। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী।

১২। বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

১৩। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য— সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৪। বাংলার নবজাগরণ— মতিলাল মজুমদার।

১৫। কল্লোল যুগ— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়—৪র্থ পর্যায়)— ভূদেব চৌধুরী।

১৭। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা— ভূদেব চৌধুরী।

১৮। রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য— প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

১৯। সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ— জীবেন্দ্র সিংহরায়।

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)— দেবেশকুমার আচার্য।

২১। সাহিত্যের খুঁটিনাটি — রাণু ঘোষ কর্মকার।

২২। সাহিত্যটীকা— সনৎকুমার মিত্র।

২০। Studies in Bengali Poetry– Humayun Kabir.
২১। Studies in Bengali Novel– Humayun Kabir.
২২। Western Influnce in Bengali Literature– Priya Ranjan Sen.
২৩। Bengali Literature in the Nineteenth Century– Sushil Kumar.

●●●